শঙ্কর

(উপন্যাস)

প্রথম ভাগ

মুল্য বার আনা

প্রকাশক

বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্ লিমিটেড্

স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী

৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ;

৩৮নং জনসন রোড, ঢাকা

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক বঙ্গদেশের যাবতীয় স্কুলের জন্য
প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত
[কলিকাতা গেজেট, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৩]

তৃতীয় সংস্করণ
১৩৫১

মুদ্রাকর
শ্রীপরেশনাথ ব্যানার্জ্জী
শ্রীনারসিংহ প্রেস
৫নং কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা

বুবু

ও

খুকুকে

জন্মাষ্টমী—১৩৪৯

'সবুজ সাহিত্য আয়তন'

দমদম—২৪ পরগণা

শঙ্কর

এক

একটি ভাই আর একটি বোন—শঙ্কর ও শৈল। শৈল বড়—দিদি। শঙ্কর ছোট—ভাই।

শঙ্করের যেমন এ সংসারে ঐ একমাত্র দিদিটি ছাড়া আর আপনার বলতে কেউই ছিল না, শৈলরও তেমনি ওই ছোট ভাইটি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ ছিল না। এই বাঙলাদেশেরই এক ছায়া-নিবিড় পল্লীর বুকে একখানা কুড়েঘরে তা'রা থাকত।

বিবাহের দু' বছর পরেই স্বামীকে হারিয়ে, শৈল সেই যে একদিন রাত্রিশেষে এ বাড়ীতে এসে পা দিল, তার পর আর একটি দিনের জন্যও সে এ বাড়ীর চৌকাঠটি পর্য্যন্ত ডিঙ্গায় নি।

যখন শঙ্করের বয়স মাত্র তিন বছর, সেই সময় তার মা স্বর্গে যান এবং পরের বছরই পিতা মনোমোহনবাবুও চোখ বোজেন। সেই হ'তেই শৈল বাপ-মা-মরা ছোট ভাইটিকে বুকে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রে আসছে। তাই ত সে আজও কোথাও যেতে পারলে না। মা-হারা ভাইটিকে ফেলে সে যাবে কোথায় ?...

মনোমোহনবাবু মৃত্যুর সময় একখানি আটচালা ঘর ও কয়েক বিঘা ধেনো জমি ছাড়া আর তেমন কিছুই রেখে যেতে পারেন নি। তাইতেই কোনমতে ওদের দুটি ভাই-বোনের চ'লে যেত—তেমন কোন কষ্ট হ'ত না। ... ...

শঙ্কর আর শৈল দুটি ছিল ঠিক দুই রকমের।

শঙ্কর

শৈল যেমন ধীর স্থির, শঙ্কর ছিল তেমন অশান্ত অস্থির, যেন এক ঝলক ঝড়ো হাওয়া—দুর্দ্দাম, বেপরোয়া, দুর্জ্জয়! দিবা-রাত্র হৈ-হৈ আর ছুটাছুটি—মগজ-ভরা ওর দুষ্টুমি, দেহ-ভরা চঞ্চলতা। ও পারত না এমন কাজ এই দুনিয়ায় একেবারেই ছিল কিনা সন্দেহ! অতবড় বিশাল মধুমতী নদী, বর্ষার ঘোলাটে জল যখন তার দু'কূল ছাপিয়ে যায়—এপাড় ওপাড় দৃষ্টি চলে না, নৌকো ভাসাতে গিয়ে পাকা মাঝিরও হাত কেঁপে উঠে, কল-কল ছল-ছল ক'রে বড় বড় ঢেউগুলো ওপাড়ে যখন বালুবেলার গায়ে আছড়ে পড়ে আর এপাড়ে দিবা-রাত্র পাড়ভাঙ্গার ঝুপ্‌ঝাপ্‌ ঝপাং শব্দে বুকের মাঝটা দুরু-দুরু ক'রে কেঁপে কেঁপে উঠে, ঠিক তেমনি সময়েও শঙ্কর অনায়াসেই সেই নদী সাঁতরে এপাড় ওপাড় করতে এতটুকুও ডরায় না।

যে কালীতলার পথে সন্ধ্যার পরে কেউ হাঁটতে সাহস পর্য্যন্ত পায় না, সে-পথ দিয়ে সে ঘুরঘুট্টি

অমাবস্যার রাতেও গান গাইতে গাইতে চ'লে যায়! দিগন্তপ্রসারী ময়না বিলের কূল ঘেঁসে যেখানে ঘন কেয়াবন, সে-স্থান বিষধর সাপের আনাগোনায় এত ভয়াবহ ও বিপদসঙ্কুল যে, সে-বনের হাত কুড়ি-পঁচিশের ভিতর দিয়েও বুঝি কেউ যাতায়াত করে না, অথচ সেই কেয়াবনের পাশে ব'সে শঙ্কর বাঁশী বাজায়! একটুকু কি ভয় ডর আছে ওর!

পাড়ার লোক চমকে উঠে' বলে—"উঃ! কী দস্যি—কি বোম্বেটে ছেলে বাবা।"

স্নেহময়ী দিদির বুকখানি ভয়ে শির-শির ক'রে উঠে।...গভীর স্নেহে আদরের বাপ-মা-হারা ছোট ভাইটিকে বুকের মাঝে টেনে এনে, কপালের উপরের বিস্রস্ত এলোমেলো রুক্ষ চুলগুলো হাতের আঙ্গুল দিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলে—"হাঁরে শঙ্কু! ভয় ডর ব'লে কি তোর প্রাণে কিছু নেই রে?...কেয়াবনে যে কাল কেউটের বাসা।"

দুই হাত দিয়ে দিদিকে আঁকড়ে ধ'রে শঙ্কর

হাসতে হাসতে বলে—"কেয়াফুলের গন্ধ কি মিষ্টি বলত দিদি !"

"হায়রে, পাগল !" বলতে বলতে শৈলর চোখের কোণদুটো ভিজে উঠে। মনে মনে বুঝি

সে দেবতার চরণতলে প্রার্থনা জানায়, 'হে প্রভু ! এ অশান্তকে তুমিই দেখো।'

পাড়ার মায়ের দল নিয়তই তাঁদের ছেলেদের শাসন করেন—"ও দস্যি ছেলের সঙ্গে মিশিস্ নে।"

কিন্তু ছেলের দল মা'দের কথা এক কান দিয়ে শোনে, অন্য কান দিয়ে বের ক'রে দেয়। শঙ্কর না হ'লে যে তাদের চলে না।

এ দুনিয়ার সব কিছুই শঙ্করের ভাল লাগে—ভাল লাগে না শুধু ঐ বইয়ের হিজিবিজি কালো কালো ছোট-বড় অক্ষরগুলো; ভাবে সেগুলো যেমন বিশ্রী, তেমনি খটমটে!

গ্রামের যেখানে যত দোষ—সবই ঐ নন্দর অর্থাৎ সবাই একবাক্যে মত দেবে—'কে আর—ঐ ডানপিটে শঙ্করেরই কাজ।'

কার বাগানের আম নেই, কার গাছের কচি শশাটি খোয়া গেছে, কার গোয়ালের দরজা খোলা পেয়ে বাছুর ছুটে গিয়ে গরুর সবটুকু দুধ খেয়ে ফেলেছে—এ সবই শঙ্করের কাজ। শঙ্করের বিরুদ্ধে নিত্য এমনি শত শত নালিশে শৈলর কান ঝালাপালা হ'য়ে যায়।

শৈল, শঙ্করের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—"কেন

তুই এত দুষ্টু হ'লি শঙ্কু? তোর নিন্দা যে আমার বুকে কত বাজে তা কি তুই বুঝিস্ না ভাই?"

বলতে বলতে শৈলর চোখ দুটো ছলছলিয়ে আসে। শঙ্কর চোখ পাকিয়ে বলে—"আবার বুঝি বাগ্দী বুড়ী এসে আমার নামে নিন্দা ক'রে গেছে? দাঁড়াও মজাটা দেখাচ্ছি। শঙ্করকে চেনে না—"

শৈল চোখের জলের মধ্যেই হেসে ফেলে বলে—"পাগল!"

এ অবুঝ অশান্তকে নিয়ে শৈল কি করবে? এমনি ক'রেই ভাই ও বোনের দিন যায়; একজনের—দুষ্টুমি ক'রে, আর একজনের—নালিশ শুনে।

দুই

মর্নিং স্কুল।

দশটায় ছুটির পর ছেলের দল হৈ-হৈ করতে করতে দল বেঁধে বাড়ীমুখো চলেছে। শঙ্কর প্রভৃতি একদল সকলের আগে আগেই চলছিল। বাঁড়ুজ্জে-পাড়ার ভিতর দিয়ে চলতে চলতে মুখুজ্জে বাড়ীর সাম্‌নে এসে হঠাৎ ট্যাটন বললে—"এই শঙ্কু, চেয়ে দেখ!" ব'লে, আঙ্গুল তুলে সাম্‌নের দিকে দেখাল। মাত্র হাত দুই উঁচু পাচীলে ঘেরা রামতারণ মুখুজ্জের সখের ফল-ফলারীর বাগানের যত্নবর্দ্ধিত গাছপালাগুলো বেশ স্পষ্টই দেখা যায়।

রামতারণের কলমের আমগাছটা ফলের ভারে যেন একেবারে নুয়ে পড়েছে।

শম্ভু বললে—"দেখ শঙ্কু, ঐ গাছের আমগুলো কাঁচা-মিঠে; অমন চমৎকার আম এ গ্রামে আর কারও বাগানে পাওয়া যায় না।"

শঙ্কর উদাসভাবে জবাব দিলে—"তাতে হয়েছে কি ?"

—"তুই ত বলিস্ এ দুনিয়ায় তোর ভয়ের কারণ কিছুই নেই !"

—"তা নেই-ই ত।"

—"আনতে পারিস্ ঐ গাছের আম চুরি ক'রে ? তা হ'লে বুঝব তোর সাহসের দৌড় কত বড়। পারবি তোর সাহসের পরীক্ষা দিতে ?"

দলের আর আর সকলেরই রামতারণ মুখুজ্জের বাগানের কাঁচা-মিঠা আমের প্রতি একটা দুর্নিবার লোভ চিরদিন ছিল, কিন্তু রামতারণের গাছ হ'তে আম চুরি ক'রে আনাটা যে কী— সে-কথা ভাবতে গেলেই সকলের জিহ্বার জল জিহ্বাতেই শুকিয়ে যেত।

তা'রা কিন্তু লোভ দমন করতে পারে নি—তা'রা সকলে মিলে ঠিক করেছিল, তাদের চিরদিনকার লোভের বস্তুটা শঙ্করকে দিয়ে সংগ্রহ করবে।

সাহসের চ্যালেঞ্জ বড় ভীষণ জিনিস। তাই শঙ্কর শম্ভুর কথায় হেসে জবাব দেয়—"ওটা আমার পক্ষে এমন কিছুই শক্ত কাজ নয় শম্ভু! তবে—"

শম্ভু মাথাটা হেলিয়ে হাসতে হাসতে বললে—"আমাদের বেলায়ও ঠিক ওই একই কথা আসে 'তবে'—অর্থাৎ যদি কেউ টের পায়, তবে হেডমাষ্টারের কানে ত উঠবেই—সঙ্গে সঙ্গে বাবার কানে যেতেও খুব বেশী দেরী হবে না! তোর যতই সাহস থাক না কেন শঙ্কু, রামতারণের বাগান হ'তে আম পেড়ে আনার মত সাহস যে তোর নেই, এইটাই আজ প্রমাণ হ'য়ে গেল।" ব'লে, শম্ভু খুব হাসতে লাগল।

শঙ্করও হাসতে হাসতে বললে—"না শম্ভু, সাহস আমার যথেষ্টই আছে; কালই সেটা আমি প্রমাণ ক'রে দেব। কাল স্কুল থেকে ফেরার পথে আম চুরি করা যাবে।" এই ব'লে শঙ্কর হন্‌-হন্‌ ক'রে বাড়ীর দিকে চ'লে গেল।

পরদিন স্কুলের ছুটির পর সকলে গিয়ে রামতারণের বাগানের পিছনে জমায়ৎ হ'ল। কাপড়টা ভাল ক'রে এঁটে শঙ্কর পাচীল টপ্‌কে ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে গাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়াল।

গ্রামের মধ্যে রামতারণ মুখুজ্জে একজন বেশ ছোটখাটো ধনী ব্যক্তিই ছিলেন।

সংসারে তাঁর এক মেয়ে পুষ্প ছাড়া আর কেউই ছিল না। এই বাগানটাই ছিল তাঁর যথাসর্ব্বস্ব। এই বাগানের সব ফল-ফলারী বিক্রী ক'রে তাঁর যথেষ্টই টাকা ঘরে আসত। বাগানে কাজ করার জন্য যদিও একজন উড়ে মালী ছিল, তথাপি তিনি নিজে এক প্রকার দিবারাত্র সকল সময় যক্ষের মত বাগান আগলে বেড়াতেন। বাগানের এক একটি ফল তাঁর নিজের দেহের এক একটি অংশের মত ছিল। এহেন রামতারণের বাগানে আম চুরি করতে গিয়েছিল শঙ্কর।

কোঁচড়টা আমে যখন প্রায় ভরেছে এমন সময় "আমগাছে কে রে?" ব'লে, একটা বাজের মত কণ্ঠস্বর কানে এসে বাজল শঙ্করের। চম্‌কে নীচের দিকে চেয়ে সে দেখল, আটহাতি কাপড় পরা খালি গায়ে ঠিক

গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং রামতারণ; তাঁর করমচার মত লাল ছোট ছোট চোখ দুটি গাছের উপরে নিবদ্ধ!...

-"নেমে আয় হারামজাদা! ছুঁচো—পাজী!"

—"মুখুজ্জে মশাই, গাল দেবেন না বলছি। আমি নামছি।—"

মুখ খিঁচিয়ে রামতারণ বললেন—"না, গাল দেবে না—তোমায় পূজো করবে! নচ্ছার! বেহায়া! বেল্লিক!"

—"ফের গালাগাল দিচ্ছেন?—"

—"বোম্বেটে বদমাইস্!"

রামতারণের মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা শক্ত ইটের মত কাঁচা আম তাঁর নাকের উপরে ঠন্ ক'রে লাগল।

অমনি "ওরে বাবারে! খুন করলে রে! ওরে নিধুরে!" ব'লে আকাশফাটা চীৎকার ক'রে রক্তাক্ত নাকটা দু'হাতে চেপে রামতারণ ধূলির উপর গড়িয়ে পড়লেন। সেই ফাঁকে তর্-তর্ ক'রে গাছ হ'তে নেমে, শঙ্কর একেবারে পগার পার।...

পরের দিন থার্ড পিরিয়ডে শঙ্কর প্রভৃতি দশ-বার জনের যখন লাইব্রেরী-রুমে [illegible] পড়ল, তখন

সকলের বুকটা অজানা আশঙ্কায় দুরু-দুরু ক'রে কেঁপে উঠল।

শম্ভু আর ট্যাটন কাঁদ-কাঁদ হ'য়ে শঙ্করের সাম্‌নে এসে বললে—"কি হবে ভাই শঙ্কু! হেডমাষ্টার মশাই যদি বাবাকে ব'লে দেন—"

বিরক্তভাবে মুখটা কুঁচকিয়ে শঙ্কর বললে—"দেয় দেবে; কেন—চুরি করবার সময় মনে ছিল না ?··· ভীতু অপদার্থ কোথাকার!"

তারপরে বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে সকলে লাইব্রেরী রুমের দিকে চলল।

সরু লিক্‌লিকে বেতখানা দোলাতে দোলাতে গুরুগম্ভীরস্বরে হেডমাষ্টার সারদাবাবু সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন—"তোমরা কাল বাঁড়ুজ্জে পাড়ার রামতারণবাবুর বাগানের আম চুরি ক'রে এনেছ; শুধু তাই নয়, তাঁর নাকে ঘুসি মেরে রক্তারক্তি ক'রে এসেছ।"

"মিথ্যা কথা স্যার, ঘুসি মারা হয় নি। আম

ছুড়ে মারা হয়েছিল···তবে তাঁর মত মিথ্যুককে ঘুসি মেরে আসাই উচিত ছিল।”—কথাটা বললে শঙ্কর।

শঙ্করের কথায় তেলে বেগুনে জ্বলে’ উঠে সপাং ক’রে এক ঘা তার কাঁধের উপর বসিয়ে দিয়ে

চীৎকার ক’রে সারদাবাবু বললেন—“দোষ ক’রে আবার বাহাদুরী জানান হচ্ছে! দাঁড়াও সব সার বেঁধে, আজ বেতিয়ে লাল করব।”

সারদাবাবু একেই রেগেছিলেন, তার উপর

শঙ্করের কথায় একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে উঠলেন। তিনি নির্ম্মমভাবে হারুর পিঠে বেত চালাতে লাগলেন। সে চীৎকার ক'রে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এমন সময় বিদ্যুদ্‌-গতিতে লাফিয়ে প'ড়ে সারদাবাবুর হাত হ'তে বেতটা সবলে কেড়ে নিয়ে সাশ্রুচোখে শঙ্কর বললে—"ওদের কোন দোষ নেই স্যার! দোষ সবই আমার, আমায় মারুন।" ব'লে সে পিঠ পেতে দাঁড়াল।

—"বেশ্‌ তবে তুমিই মার খাও।"

পাগলের মতই সারদাবাবু শঙ্করের পিঠে বেত মারতে লাগলেন।

শঙ্কর একটি কথাও না ব'লে নীরবে মার হজম ক'রে গেল; তারপর ধীরে ধীরে বললে—"স্যার! আজ রাগের বশে যে মার আমায় মারলেন, এর জন্য হয়ত একদিন আপনাকে অনুতাপ করতে হবে।" ব'লে সহসা সে নীচু হ'য়ে হেডমাষ্টার মশায়ের

পায়ের ধূলো নিয়ে ঘর হ'তে নীরবে বেরিয়ে গেল।...

সারদাবাবু বহুক্ষণ ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে শঙ্করের গমন-পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ছুটির পর আবার হেডমাষ্টারের ঘরে সকলের ডাক পড়ল।

সকলে ঘরে ঢুকতেই সারদাবাবু সহসা শঙ্করকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে ফেললেন, বললেন—"আমায় মাপ কর শঙ্কর।"

তাড়াতাড়ি নীচু হ'য়ে তাঁর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে সে বললে—"ছিঃ ছিঃ! ও কথা বলবেন না স্যার—আমি যে আপনার সন্তান-তুল্য।"

তিন

সেদিন বিকালে খেলার মাঠে রজত সকলকে বললে—"এই জানিস্—কাল আমার মামাত ভাই অলোক আসছে।"

তার কথায় সকলেই উৎসুক হ'য়ে শুধালে—"সকালের ষ্টীমারে বুঝি ?"

—"হাঁ।"

রজতের এই মামাত ভাইটি যে তার কত বড় গর্ব্বের বিষয় ছিল, তা তার সমবয়সী বন্ধুবান্ধবেরা সকলে বেশ ভালভাবেই জানত। তার মত বুদ্ধিমান, তার মত শক্তিশালী, তার মত খেলোয়াড় রজতের মতে আর একটি মেলে কিনা খুবই সন্দেহ। প্রায় প্রতি ছুটিতেই রজত মামার বাড়ী হ'তে ঘুরে এসে অলোকদা'র গল্পে এমন পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠত যে, তার জের দু'তিন মাসের কমে থামতেই চাইত না।

এহেন যে অলোকদা' সে কিনা আসছে, আর তাদেরই গ্রামে। আশ্চর্য্য হবারই কথা!...

দিন দুই পরের ঘটনা। রজতের অলোকদা'কে নিয়ে ছেলেদের মধ্যে যে বেশ একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে—ঘরে ব'সেই শঙ্কর তা শুনেছে; অথচ ঘরোয়া কাজে সে এ ক'টা দিন এত বেশী ব্যস্ত ছিল যে, রজতের অলোকদা'কে একটিবার দেখে আসার পর্য্যন্ত ফুরসৎ পায় নি।

শঙ্কর বাইরের ঘরে মাদুর বিছিয়ে স্কুলের টাস্ক করছিল, এমন সময় হারু আর শম্ভু ঘরে ঢুকে বলল —"শঙ্কর, আজ নদীতে স্নান করতে যাবি ভাই?"

—"কেন রে—হঠাৎ নদীতে স্নান করবার সখ হ'ল কেন? বাঁড়ুজ্জেদের দীঘিতেই বেশ স্নান করা যায়।"

"দরকার আছে—তুই যাস্ না!" ব'লে তা'রা চ'লে গেল।...

যথাসময়ে শঙ্কর নদীর ঘাটে গিয়ে দেখলে যে

সেখানে দলের প্রায় সকলেই জমায়ৎ হয়েছে। তাকে দেখে একটি সুশ্রী ছেলে এগিয়ে এসে রজতকে সম্বোধন ক'রে বললে—"এই তোদের শঙ্কর ?..."

রজত মাথা নেড়ে জবাব দিলে—"হুঁ।"
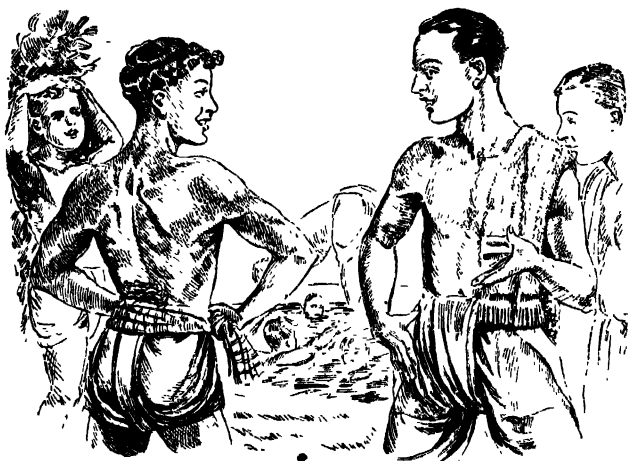
—"এরা সব ধরেছে আমায়, তোমার সাথে একটা সাঁতারের পাল্লা দিতে। তুমি জান না বোধ হয়, এবার আহিরীটোলায় সাঁতার প্রতিযোগিতায় আমি ফার্ষ্ট হয়েছি। তা তুমি যদি ইচ্ছা কর—"

ওর কথায় আম্‌তা-আম্‌তা ক'রে শঙ্কর বললে —"আমি ত তেমন ভাল সাঁতার জানি না। আপনি যদি বলেন—তা হ'লে না হয় একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।"

পরম বিজ্ঞের মত মাথাটা নাড়তে নাড়তে অলোক বললে—"হাঁ, এই ত পুরুষের মত কথা; এস।" ব'লে এক অদ্ভূত ভঙ্গিতে লাফ দিয়ে অলোক গিয়ে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শঙ্করও তার পিছু পিছু জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ডুব দিল।

খানিকটা গিয়েই অলোক বুঝতে পারল যে, এ কলকাতার গোলদীঘি নয়। বহু কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে সে ওপাড়ে পৌঁছাল, কিন্তু তার প্রায় মিনিট পনের আগেই শঙ্কর ওপারে পৌঁছে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। ওকে হাঁপাতে দেখে শঙ্কর বললে—"অলোকবাবু, আপনি দেখছি বড্ড হাঁপিয়ে পড়েছেন। ওই যে দূরে মধুর খেয়াঘাট দেখা যাচ্ছে, ওখানে গিয়ে নৌকোয় ক'রে ফিরবেন।

আমি যাই।” ব’লে সে আবার জলে প’ড়ে এগিয়ে যেতে লাগল।

ফিরে এসে অলোক দেখলে এক শঙ্কর ব্যতীত আর সকলেই সেখানে উপস্থিত আছে। ওকে দেখে সকলেই একসাথে চীৎকার ক’রে উঠল—“এই যে অলোকবাবু! ডিরেক্ট বুঝি আমেরিকাতেই চ’লে গেছিলেন, তাই ফিরতে এত দেরী হ’ল!...”

একবার শুধু সরোষকটাক্ষে ওদের দিকে তাকিয়ে অলোক রজতকে বলল—“বাড়ী চল রজত।”

পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় অলোকের হাতে একটা লাঠি দেখে সকলেই জিজ্ঞেস করেছিল, ‘লাঠিটার দাম কত?’ তাতে অলোক জবাব দিয়েছিল, ‘ওটা ডিরেক্ট আমেরিকা হ’তে সাত শ’ টাকায় আনান।’ ছেলেরা আজ সে-কথারই শোধ নিলে।

চার

অলোকদা'র যে শেষ পর্য্যন্ত শঙ্করের কাছে এমনি বিশ্রী পরাজয় ঘটবে সেটা রজত একটি বারের জন্যও ভাবতে পারে নি। এই ঘটনার পর হ'তে হারু, ট্যাটন ওরা যে তাকে দিন-রাত বিদ্রূপের বাণে জর্জ্জরিত ক'রে তুলবে এবং তার এখানকার জীবন একেবারে বিষময় হ'য়ে উঠবে, এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে গিয়ে রজতের দু' চোখ জলে ভ'রে গেল। সে একটি কথাও না ব'লে নীরবে অলোকের আগে আগেই অন্যমনস্কভাবে পথ চলতে লাগল। অলোকও ঐ ভাবে হেরে গিয়ে রজতের কাছে একটু বিব্রত হ'য়ে পড়েছিল। সে মনে মনে ভাবছিল এর পরে রজতের কাছে কি ভাবে মানটা বজায় রাখা যায়।

দোর-গোড়াতেই অলোকের বোন সুজাতা

দাঁড়িয়েছিল। ওদের দু'জনকে ফিরতে দেখে সে উৎসুক হ'য়ে শুধালে—"কি হ'ল রজতদা, সাঁতারে কে জিতলে ?"

রজত মুখটা কাচুমাচু ক'রে পাশ কাটিয়ে ঘরের মধ্যে চ'লে গেল। সুজাতার কথার উত্তর দেওয়ার মত উৎসাহ তখন আর তার ছিল না। কিন্তু অলোক বললে—"এখানে নীচেকার স্রোতটা খুব বেশী সুজাতা ; তা ত আর আমি জানতাম না। এখানকার ছেলেরা তাতে অভ্যস্ত—তা'রা তাতেই দিব্যি সাঁতার কাটে। হ'ত আমাদের গোলদীঘি, তবে দেখে নিতাম এক হাত !"

সুজাতা হেসে বললে—"শেষ পর্য্যন্ত একটা গেঁয়ো ভূতের কাছে হেরে এলে দাদা !"

অলোক মনে মনে ভাবলে, 'হুঁ গেঁয়ো ভূতই বটে, নইলে...' কিন্তু মুখে বললে—"ঐ সাঁতারেই একটু যা আছে ; আসুক না দেখি হকি, ক্রিকেট, টেনিস—এসব খেলায়, তবে ত বুঝি !"

বিকালের দিকে রজতকে বেরুতে দেখে সুজাতা বললে—"কোথায় যাচ্ছ রজতদা' ?"

রজত বললে—"লোহাগাড়ার সঙ্গে আমাদের গ্রামের 'ভেল ডিগ্ ডিগ্' ম্যাচ আছে, তাই মাঠে যাচ্ছি।"

তার কথা শুনে সুজাতা বললে—"আমিও তোমার সঙ্গে খেলা দেখতে যাব রজতদা'! আমায় নিয়ে যাবে ?"

এমন সময় জাহ্নবী দেবী—রজতের মা—সেখানে এসে প্রবেশ করলেন, বললেন—"কোথায় যাবি রে সুজাতা ?"

সুজাতা পিসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—"রজতদা'র সঙ্গে খেলা দেখতে যাব পিসিমা!"

জাহ্নবী দেবী বললেন—"কিসের খেলা রে রজত!"

মা'র কথার উত্তরে রজত বললে—"ভেল ডিগ্ ডিগ্ শীল্ড ফাইনাল আছে আজ—মা।"

জাহ্নবী দেবী বললেন—“আচ্ছা যাও, কিন্তু আবার বেশী রাত ক’রো না যেন।”

যাবার সময় অলোকও ওদের সাথী হ’ল। সকলে খেলার মাঠের দিকে রওনা হ’ল। বৈকালের পড়ন্ত রোদ মাঠের মাঝের খেজুরগাছগুলোর পাতায় পাতায় যেন সিন্দুর মাখিয়ে দিয়েছিল। মাঠের একদিকে নদী, তার জলেও তখন আবীর-খেলা চলছিল। খেলার মাঠে তখন অনেকেই জমায়ৎ হয়েছিল। বিভিন্নবয়সী ছেলেদের কল-কোলাহলে স্থানটি যেন সরগরম হ’য়ে উঠেছে।

খেলা আরম্ভ হ’তে তখনও একটু দেরী ছিল; কেননা প্রেসিডেণ্ট জমিদার সত্যবাবু—রজতের পিতা—তখনও সেখানে এসে পৌঁছান নি। অল্পক্ষণ বাদেই তিনি এসে হাজির হ’লেন, রেফ্রী ‘হুইসেল’ বাজিয়ে খেলা আরম্ভ ক’রে দিলে।

খেলা আরম্ভ হ’তেই দেখা গেল বিপক্ষ দল রজতদের দল হ’তে যথেষ্ট নিপুণ। খুব অল্প সময়ের

মধ্যেই রজতদের দলের জন তিনেক ছাড়া সকলেই মার দিল। বিপক্ষ দলের ঘন ঘন চীৎকার ক্ষণে ক্ষণে স্থানটিকে মুখরিত ক'রে তুলতে লাগল। রজতদের দলের হারবার একটা কারণও ছিল ; কেননা তাদের দলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় শঙ্কর সেদিন আসতে পারে নি—তাদের বাড়ীর বুধী গাইটা হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়ায়। এমন সময় ভিড়ের মাঝ হ'তে একটা অস্ফুট গুঞ্জন উঠল, 'শঙ্কর এসেছে! শঙ্কর এসেছে!'

সুজাতা দেখলে, বলিষ্ঠ দোহারা চেহারার একটি ছেলে এসে মাঠের মাঝে দাঁড়াল। কোঁকড়া কোঁকড়া মাথার চুলগুলো নিয়ে বাতাসে খেলা করছিল। সে এক লাফ দিয়ে গিয়ে কোর্টের মাঝে পড়ল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই খেলার গতি ফিরে গেল। বিদ্যুদ্‌গতিতে দম নিয়ে গিয়ে শঙ্কর বাঘের মতই বিপক্ষ দলের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ল—বিপক্ষ দলকে সন্ত্রস্ত ও ভীত ক'রে দিতে। শঙ্কর এক দমে

দু'জনকে 'মার' ক'রে ঘরে ফিরে এল! বিপক্ষ দলের উল্লাসকে ডুবিয়ে দিয়ে এদের দল দ্বিগুণভাবে জয়ের আনন্দে কোলাহল ক'রে উঠল। শঙ্করদের দলেরই অবশেষে জিত হ'ল। তার খেলা দেখে দর্শকেরা সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগল। তার সেদিনকার খেলা সত্যই বড় চমৎকার হয়েছিল।

বড়রা সকলে শঙ্করকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বলতে লাগলেন—"আজকে গাঁয়ের মান তুই রেখেছিস্ শঙ্কর!...বেঁচে থাক বাবা!" ছোটরা কেউ তার হাত, কেউ কোমর ধ'রে ঝুলে প'ড়ে তাকে 'শঙ্করদা' 'শঙ্করদা' ব'লে ডেকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলল। শঙ্কর কাউকে বুকের উপর তুলে, কারুর গালটা একটু টিপে দিয়ে, কারুর পিঠে একটা মৃদু চাপড় দিয়ে, তাদের সকলকেই সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করল।

সুজাতাকে অলোকের কাছে ফেলে রেখে রজত সেই দলের মধ্যে ভিড়ে গিয়েছিল; খানিকক্ষণ পরে সে যখন ফিরে এল, সঙ্গে তার শঙ্কর। শঙ্কর

মৃদু হেসে অলোককে অভিনন্দন জানিয়ে বললে—“আমাদের এ গ্রামের খেলা কেমন লাগল আপনার, অলোকবাবু ?”

অলোক গভীর ঔদাস্যে মুখটা টেনে বললে—“মন্দ না, তবে বড্ড গেঁয়ো আর নেষ্টি (nasty) !”

শঙ্কর হেসে জবাব দিলে—“জানেনই ত গ্রামের লোকেরা কত গরীব! তা’রা পয়সা খরচ ক’রে খেলবে কোথা হ’তে বলুন। তাই যে সব খেলায়

পয়সা খরচ হয় না তাই নিয়েই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়।...আর যখন এদেশে বিদেশী খেলার আমদানি হয় নি, তখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ত এই সব খেলাই খেলতেন।”

শঙ্করের কথায় সহসা কে যেন অলোকের মুখে এক পোঁচ কালি লেপে দিলে। সে একটু রূঢ়ভাবেই জবাব দিলে—“হাঁ তা ঠিকই, গরীবের ঘোড়া রোগ সাজবে কেন ?”

আরও দু’একটা কথা ব’লে শঙ্কর বিদায় নিয়ে গেলে, অলোক বললে—“দেখলি রজত, ছেলেটা কি অভদ্র ! ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে পর্য্যন্ত জানে না।”

সে-কথার জবাব দিলে সুজাতা—“কেন দাদা, উনি কোন খারাপ কথা তো আর বলেন নি, বরং সত্য কথাই বলেছেন।”

পাঁচ

ধরণীর বুকে তখন সাঁঝের আঁধার বেশ ভালভাবেই ছড়িয়ে পড়েছে। গৃহলক্ষ্মীদের শঙ্খের ধ্বনি সাঁঝের বাতাসে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। গ্রামের পথঘাট এর মধ্যেই অন্ধকারে দুর্গম হ'য়ে উঠেছিল। পিছন হ'তে শঙ্করদের দলের উল্লসিত চীৎকার কানে এসে বাজছিল। সকলে চলতে চলতে প্রায় কালীতলার কাছাকাছি এসে পড়েছিল, আর একটা মোড় ঘুরলেই জমিদার-বাড়ী।...

এই কালীতলায় প্রতি বৎসর শীতের এক অমাবস্যার রাতে খুব ধূমধাম ক'রে শ্মশানকালীর পূজো হয়। কালীতলা সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী ছিল; এমন কি দিনের বেলায়ও ওই পথ দিয়ে যাতায়াত করতে অতিবড় সাহসী ছেলেরও বুক দুরু-দুরু ক'রে উঠে—রাতের বেলা ত কথাই নেই।

শঙ্কর

কালীতলার সাম্‌নেই ছিল একটি অতি পুরাতন বটগাছ। কবে থেকে কেমন ক'রে এই গাছটা দিনের পর দিন গ্রামের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে নিজেও বয়সে বেড়ে চলছিল তা কেউ জানে না। সেই বটগাছের ঠিক পাশেই একটা চালতাগাছ।

ঐ চালতাগাছে একবার এক নমঃশূদ্রের বিধবা বৌ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। সেই থেকে অনেকেই নাকি ওখানে কত কি দেখেছে! অলোক গ্রামে এসে রজতের কাছে সে-সব কথা শুনেছিল এবং এক প্রকার তাচ্ছিল্যভাবেই বলেছিল, 'ওসব একদম বাজে কথা রজত, আমি ওসব মানি না। একদিন রাত্রে গিয়ে ওর একটা ডাল কেটে আনব, দেখিস্!' সেদিন অলোকের কথায় রজত কোনই জবাব দেয় নি। আজ হঠাৎ সেইখানে এসে পড়ায় রজত আঙ্গুল দিয়ে সেই চালতাগাছটা দেখিয়ে বললে—"ঐ সেই চালতাগাছ অলোকদা', এখানেই নমঃশূদ্র-বাড়ীর বিধবা বৌ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল।"...

সেই অন্ধকারাবৃত নির্জ্জন গ্রাম্য পথে নেহাৎ আনমনে চলতে চলতে—রজতের কথায় অলোকের সর্ব্বাঙ্গ এক অভাবনীয় ভয় ও আশঙ্কায় শির্-শির্ ক'রে উঠল। হঠাৎ সেই অবস্থায় গাছটার দিকে চাইতেই তার দু'চোখ কপালে উঠে' গেল। ঐ না কে একজন শাড়ী প'রে ঘোমটা দিয়ে ডালের পরে ব'সে!...'ভূত! ভূত!' ব'লে একটা ভয়-মিশ্রিত চীৎকার ক'রে অলোক সেইখানেই অজ্ঞান হ'য়ে পড়ল, তার পরেই হ'ল একটু অস্ফুট গোঁ-গোঁ আওয়াজ!

কতকটা চকিত হ'য়েই রজত ও সুজাতা সেই সঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠল।

শঙ্কর তখন রজতদের কাছ থেকে বেশী দূরে ছিল না। সে এই দিকেই কি একটা কাজে এক নমঃশূদ্র-বাড়ী আসছিল। ওদের চীৎকার কানে প্রবেশ করতেই সে দৌড়ে এগিয়ে এল। অলোক তখনও প'ড়ে গোঁ-গোঁ করছিল, আর সুজাতা ও রজত অন্ধকারে জড়াজড়ি ক'রে চীৎকার করছিল।

"কি হয়েছে ? কি হয়েছে রজত ?"—বলতে বলতে শঙ্কর এসে তাদের উঠালে।

ঐ স্থানের ঠিক পাশেই এক ঘর নমঃশূদ্র—জমিদারবাবুর প্রজা—থাকত। এদের গোলমাল শুনে তা'রাও আলো নিয়ে এসে হাজির হ'ল।

শঙ্করের কথামত একজন দৌড়ে গিয়ে এক ঘটি জল এনে দিল। জলের ঝাপ্‌টা ও বাতাস করতে করতে অলোকের জ্ঞান ফিরে এল। সে ভয়-চকিত-নয়নে চারদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল।

স্নেহমাখা স্বরে শঙ্কর শুধালে—"এখন কেমন বোধ করছেন অলোকবাবু ?"

রজতের মুখে সমস্ত কথা শুনে শঙ্কর দেখলে ব্যাপারটা কিছুই না। চালতাগাছের একটা ডাল বটগাছের উপর এসে পড়েছে এবং তাতেই মৃদু জ্যোৎস্না এসে পড়ায় সেটাকে একটা কাপড়ের মতই দেখাচ্ছিল। যা হউক শঙ্কর সকলকে নিয়ে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য এগিয়ে চলল।

চাঁদের আলোয় খোলা ছাতে পাটি পেতে জাহ্নবী দেবী কার সঙ্গে যেন গল্প করছিলেন। এমন সময় শঙ্করের গলা শোনা গেল—"জ্যেঠাইমা!"

—"কে রে?"

ও জবাব দিলে—"আমি শঙ্কর।"

শঙ্করের মুখে সকল কথা শুনে জাহ্নবী দেবী বললেন—"তখনই ত আমি ব'লে দিয়েছিলাম—'রজত, বাড়ী ফিরতে রাত করিস্‌নে।'...তা তোরা ত

কেউই আমার কথা শুনবি না! দেখ্ দেখি শঙ্কর আজ না এসে পড়লে কি কেলেঙ্কারীটাই না হ'ত!"

শঙ্কর বাধা দিয়ে বললে—"থাক জ্যেঠাইমা, আজ ওরা বড্ড শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছে। আজ আর ওদের কিছু বলবেন না। ওরা এখন বিশ্রাম করুক। এখন তবে যাই জ্যেঠাইমা, কাল এসে একবার না হয় ওদের খবর নিয়ে যাব।"...

তারপরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে শঙ্কর বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল। দেউড়ির কাছে সুজাতার সঙ্গে শঙ্করের দেখা হ'য়ে গেল; সে বললে—"আজ আপনি না থাকলে আমাদের কি দশা হ'ত!"—

শঙ্কর অল্প একটু হেসে জবাব দিলে—"সত্যি, ভয়ের তো কিছু ছিল না, শুধু শুধু তোমরা ভয় পেয়ে গেছিলে।...আচ্ছা, তবে আজ আসি।" এই ব'লে শঙ্কর আঁধারে মিলিয়ে গেল।

ছয়

ভোরের বেলা সুজাতা আর রজত ফুল তুলতে গেছিল। বাঁড়ুজ্জেদের দীঘির পাড়ে ছিল প্রকাণ্ড একটা স্বর্ণচাঁপার গাছ। সেইখানে এসে তা'রা দেখলে সুজাতারই সমবয়সী একটি মেয়ে সাজি হাতে নিয়ে চাঁপাগাছের নীচে দাঁড়িয়ে; আর গাছের উপর থেকে কে যেন একটা দুটো ক'রে ফুল ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। রজতদের আসতে দেখে মেয়েটি সোল্লাসে চীৎকার ক'রে উঠল—"দেখ রজতদা', শঙ্করদা' আমায় কত ফুল পেড়ে দিয়েছে।"

"শঙ্কর বুঝি গাছে উঠেছে পুষ্প।"—শুধালে রজত।

পুষ্প জবাব দিলে—"হাঁ, ঐ দেখ না একেবারে মগডালে উঠে ফুল পাড়ছে।"

মেয়েটির নাম পুষ্প। রামতারণের একটি মাত্র মাতৃহারা সন্তান সে। পুষ্পর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে

রজত আর সুজাতা দেখলে সত্যই একেবারে ওই উঁচু একটা ডালে এক থোবা ফুল সে পাড়ার চেষ্টা করছে। অল্পক্ষণ বাদে শঙ্কর এক কোঁচড় ফুল নিয়ে গাছ হ'তে নেমে এল। রজত বললে—"আমায় কতকগুলো ফুল দে-না শঙ্কর!"

শঙ্কর কিছু ফুল রজতকে দিলে। তারপর কোমরের এক দিক হ'তে কাপড়ের বাঁধনটা আল্গা ক'রে সে একটি বড় আর একটি অল্প একটু ছোট ফুল বের করলে। ফুল দুটি অন্যান্য ফুলের চাইতে দেখতে অনেক বড় ও সম্পূর্ণ ফোটা। ফুল দুটি দেখে পুষ্প সোল্লাসে চীৎকার ক'রে বললে—"আমায় ঐ ফুল দুটো দাও না শঙ্করদা'!"

শঙ্কর সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধালে—"নেবে?"

শঙ্করের কথায় সুজাতা মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালে, শঙ্কর বড় ফুলটা পুষ্পকে দিল এবং ছোটটা সুজাতার দিকে এগিয়ে ধরল।

সহসা একটা কাণ্ড হ'য়ে গেল। সুজাতার হাতে ফুলটা দিতেই সে সেটা হাতের মধ্যে দলে' মুচড়ে একটান মেরে ফেলে দিল, তারপর হন্-হন্ ক'রে সে-স্থান ত্যাগ ক'রে চ'লে গেল। সকলে অবাক্ হ'য়ে তার যাবার পথের দিকে তাকিয়ে রইল। রজত, শঙ্কর বা পুষ্প কেউই ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না। ফুলটা ইচ্ছা ক'রে হাতে নিয়ে এমনি ক'রে সে কেন নষ্ট ক'রে গেল!

শঙ্কর রজতের দিকে চেয়ে বললে—"কি হ'ল রে রজত, অমন ক'রে ও চ'লে গেল কেন?"

রজত উদাসভাবে বললে—"কি জানি—"

পুষ্প বললে—"আমি বুঝতে পেরেছি শঙ্করদা'! বড় ফুলটা আমায় দিয়েছ কিনা—তাই হিংসায় ও অমন ক'রে ফুলটা ফেলে দিয়ে চ'লে গেল।"

শঙ্কর অল্প একটু হেসে উত্তর দিলে—"আচ্ছা পাগল ত!"...

দুপুরের কথা। স্নানের ঘাটে তখন অসম্ভব

ভিড়। ছেলেমেয়েদের ঝাঁপাঝাঁপিতে দীঘির জল তোলপাড় হচ্ছে। কেউ সাঁতার দিয়ে, কেউ ডুব-সাঁতার দিয়ে যে যার কেরামতি দেখাতে ব্যস্ত। এমন সময় রজত, সুজাতা ও শম্ভু এল স্নান করতে। শঙ্কর গলা জলে দাঁড়িয়ে একটি ছোট ছেলেকে সাঁতার শিখাচ্ছিল।

দীঘির ঠিক মাঝখানে গোটা তিনেক বড় বড় পদ্মফুল হাওয়ার বুকে দুলছিল। সেই দিকে চেয়ে সকালবেলার সেই পুষ্প নামক মেয়েটি চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল—"শঙ্করদা', ওখান থেকে একটা ফুল আমায় এনে দাও না!"

পুষ্পর চীৎকারে সুজাতার নজরও সেখানে গিয়ে পড়েছিল। সে রজতের দিকে তাকিয়ে বললে—"কি সুন্দর ফুল, দেখ রজতদা'!"

কথাটা শঙ্করেরও কানে গেছিল। সে রজতকে ডেকে বললে—"আয় রজত, সাঁতরে গিয়ে ফুল তুলে আনা যাক্!...দেখা যাক্ কে আনতে পারে।"

"তোমার সঙ্গে সাঁতারে আর আমি পারব না ভাই।"—বললে রজত।

"বেশ ত, তুই আগে খানিকটা সাঁতরে এগিয়ে যা ; আমি না হয় পরে যাব।"—বললে শঙ্কর।

তাই করা হ'ল, কিন্তু তবুও রজতের পৌঁছবার ঢের আগেই শঙ্কর গিয়ে দুটি ফুল ছিঁড়ে নিলে। ঘাটে এসে শঙ্কর এবার আর ভুল করলে না, বড় ফুলটি নিয়ে সুজাতার হাতে তুলে দিয়ে বললে—

"ফুল নাও!"...তারপর পুষ্পকে অন্য ফুলটি দিলে। সুজাতা ফুলটা হাতে নিয়ে নাকের কাছে চেপে ধরলে। তার মুখে ফুটে উঠল এক টুকরো সাফল্যের হাসি।

ইতিমধ্যে রজত ও অপর ফুলটা নিয়ে ঘাটে ফিরে এসেছিল। সুজাতা তখনও শঙ্করের দেওয়া পদ্মটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল, আর শঙ্কর মুগ্ধদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে শঙ্কর মৃদুস্বরে সুজাতাকে শুধালে—"আর রাগ নেই ত?"

সুজাতা একটু হেসে ওর মুখের দিকে তাকালে। স্নানের ঘাটের ভিড়টা তখন ধীরে ধীরে পাত্‌লা হ'য়ে আসছে। পথের বাঁকে বিদায় নেবার সময় শঙ্কর সুজাতাকে বললে—"কাল সকালে এস, কোঁচড় ভর্ত্তি ক'রে তোমায় স্বর্ণচাঁপা দেব।...আসবে ত?"

সুজাতা ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে—"আসব।"

সাত

সেদিন বাড়ীতে এসে সুজাতা শঙ্করের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠল। খেতে ব'সে সে বললে—"ভারি চমৎকার ছেলে কিন্তু শঙ্কর, না রজতদা' ?"

রজত জবাব দিলে—"সত্যিই সুজাতা, ওকে আমার বড় ভাল লাগে।"...

সেদিনই দুপুরের পরে রজতকে ছিপ্ নিয়ে বেরুতে দেখে অলোক শুধালে—"কোথায় যাচ্ছিস্ রে রজত ?"

একে ত ক'দিন আগে নদীর ঘাটে সামান্য একটা গেঁয়ো ছেলের কাছে সাঁতারে পরাজয়ের ব্যথা অলোক কোন মতেই ভুলতে পারছিল না, তার উপরে আবার কালীতলায় ভূত দেখার ব্যাপার তাকে আরও ম্রিয়মাণ ক'রে ফেলেছিল।

সে স্পষ্টই মনে মনে অনুভব করছিল—এই দুই ব্যাপারে রজতের চোখে সে আগের চাইতে অনেকটা নীচু হ'য়ে গেছে। আগে তার প্রতি কথায় রজত যেমন একেবারে মুগ্ধ ও বিস্মিত হ'য়ে যেত এবং সেই সব কাহিনী শুনবার জন্য তাকে সব সময়ই ব্যস্ত ক'রে তুলত, এখন আর সে ওসব মোটে শুনতেই চায় না—বরং কিছু বলতে গেলে যথেষ্টই বিরক্ত হ'য়ে উঠে অথবা নানা কাজের অছিলায় সেখান হ'তে পালাতে পারলে যেন বাঁচে। যদিও রজত স্পষ্টাস্পষ্টি মুখের উপর তাকে কিছু বলত না, তবু সে যে তাকে আজকাল এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে, সেটা অলোক সহজেই বুঝতে পারত, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা নিষ্ফল ক্রোধে শঙ্করের প্রতি সে যেন একেবারে মরিয়া হ'য়ে উঠত। কিন্তু কোন উপায় না দেখে মনের রাগ সে মনেই চেপে রাখত।

অলোকের কথায় রজত সহজভাবে জবাব দিলে —"মাছ ধরতে যাচ্ছি—নদীতে।"

অলোক বললে—"আমিও যাব।"

নদীর পথে সত্যবানদের বাড়ী। সত্যবান ছিল ক্লাশের সর্ব্বাপেক্ষা সেরা ছাত্র। সে তখন বাইরের দাওয়ায় মাদুর পেতে একমনে এল্‌জেব্‌রা কষছিল। রজত সত্যবানকে দেখিয়ে অলোককে বললে—"জান, ওই আমাদের ক্লাশের ফার্ষ্ট বয়।"

এমন সময় পাশের বাগান হ'তে কে যেন ডেকে উঠল—"রজতদা' !"

ডাক শুনে রজত ও অলোক মুখ ফিরিয়ে দেখলে, এক কোঁচড় কাঁচা আম নিয়ে পুষ্প আর একটি ছোট মেয়ে ওদের দিকেই আসছে। রজতকে ডেকেছিল সত্যবানেরই ছোট বোন টুকুন।

টুকুন ছুটতে ছুটতে এসে রজতের একটা হাত ধ'রে ঝুলে প'ড়ে বলল—"কোথায় যাচ্ছ রজতদা' ?"

—"তোর কোঁচড়ে কি রে টুকুন ?"

—"আম। পুষ্পদি' ওদের বাগান থেকে মালীর কাছে চেয়ে এনেছে ; দাদা খেতে চেয়েছে যে।"

ওদের সকলের কথাবার্ত্তার আওয়াজ সত্যবানের

রজতের হাত ধ'রে ঝুলে প'ড়ে···

কানে যেতেই সে চোখ তুলে সাম্‌নের দিকে চাইল —সকলের সাথে চোখাচোখি হ'য়ে গেল।

সত্যবান এগিয়ে এসে বললে—"রজত যে, কোথায় চলেছ ?"

রজত বললে—"নদীতে মাছ ধরতে যাচ্ছিলাম। টুকুন ডাকলে, তাই ওর সঙ্গে কথা বলছি।"

সত্যবান মুখটা বেঁকিয়ে একটুখানি কাষ্ঠহাসি হেসে বললে—"মাছ ধরতে! লেখাপড়া বুঝি তোমার সব হ'য়ে গেছে, তাই এখন মাছ ধরতে চলেছ ?"

রজত ছিপের সূতোটা টেনে লম্বা করতে করতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—"না, হয় নি ; কিন্তু তা দিয়ে কোন দরকার আছে ব'লেই আমার মনে হয় না।"

—"এখনও তোমায় সাবধান ক'রে দিচ্ছি রজত, শঙ্করকে ছাড়, নইলে কোনও দিনই মানুষ হ'তে পারবে না।"—বললে সত্যবান।

"মানুষ হয়ত সত্যিই কোন দিনও হ'তে পারব না সত্যবান, কিন্তু তোমার মত অমানুষও হ'তে

পারব না। তুমি শঙ্করকে যতই হিংসা কর না কেন, আমরাও জানি এবং তুমি নিজেও জান যে, তার পায়ের ধূলির যোগ্যও তুমি নও।”—ব’লে, রজত অলোকের দিকে চেয়ে বললে—“চল অলোকদা’, ওর মত নিন্দুকের সঙ্গে কথা বলতেও আমার ঘৃণা হয়।”...

অলোক এখানে পা দেওয়া অবধি দেখছিল, শঙ্করকে বাদ দিয়ে এখানে একটি দিনও চলা যায় না। ছোট-বড় সকলেই শঙ্করদা’ বা শঙ্কর বলতে যেন একেবারে অজ্ঞান। সে তার নিজের আশে-পাশে এমন একটা গণ্ডি র’চে, ফেলেছিল যে, এখান-কার সকলের সেই গণ্ডির বাইরে যাওয়ার সাধ্য ছিল না। এখানকার কেউই শঙ্করকে পৃথক্ ক’রে ভাবে না বা দেখে না। শঙ্করের এতখানি আধিপত্য কিন্তু অলোকের মোটেই সহ্য হ’ত না।

ছেলেদের মধ্যে এক একজন আছে—যাদের স্বভাবই হচ্ছে অন্যের উপরে হুকুম চালান বা

কর্ত্তৃত্ব করা। সেই কর্ত্তৃত্বের মধ্যে কোথাও একটুকু বাধা-বিপত্তি দেখা দিলেই তা'রা ভীষণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠে এবং সেই বাধাকে দু' পায়ে থেঁতলে এগিয়ে যেতে চায়। এখানে আসার পর অলোকের অবস্থাটাও অনেকটা ঐ রকমই হয়েছিল। যখন সে বারংবার শঙ্করের কাছে পরাজিত হচ্ছিল, তখন সেই পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্তির আশায় ছট্‌ফট্ করতে লাগল। এমনি যখন মনের অবস্থা, তখনই তার দেখা হ'ল সত্যবানের সাথে। সেও ঠিক সত্যবানের মত শঙ্করকে দু' চক্ষে দেখতে পারত না। তাই রজত তাকে চ'লে যেতে বলায় সে বললে—"তুমিই মাছ ধরতে যাও রজত, আমি ততক্ষণ এর সঙ্গে একটু গল্প করি।"

রজত আর কোন কথা না ব'লে শুধু অলোকের দিকে একবার রাগতভাবে তাকিয়ে হন্-হন্ ক'রে ছিপ্ হাতে নদীর দিকে চ'লে গেল।

আট

গ্রামে ছিল দুটো দল। একটা শঙ্করকে নিয়ে আর একটা সত্যবানকে নিয়ে। তবে শঙ্করেরাই ছিল সংখ্যায় বেশী।

সত্যবানকে ঘিরে গোটা চার-পাঁচ ছেলে শান্ত সুবোধ বালকের মত নিয়মিত প্রথম বেঞ্চিতে ব'সে নিজেদের ধন্য মনে করত এবং শঙ্করের দলের কাউকে দেখলেই তাদের চোখ-মুখ ঘৃণায় কুঁচকে ছোট হ'য়ে যেত, কিন্তু তার জন্য অন্য দলের একটুকু কিছু এসে যেত না, তা'রা নির্ব্বিবাদে নিজেদের নিয়ে মেতে থাকত।

সত্যবানের দলের ছেলেরা মুখে যতই বলুক না কেন, শঙ্করের দলের সঙ্গে হাতাহাতি করবার তাদের মোটেই সাহস হ'ত না; কেননা অন্য দলের সকলেই আখড়ায় গিয়ে নিয়মিত কুস্তি আর

লাঠি খেলে' নিজ নিজ শরীরকে যথেষ্ট সবল ও সুন্দর ক'রে তুলেছিল।...

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি গ্রামের মধ্যে হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে' গেল।

গ্রামে যোগেন্দ্র বাঁড়ুজ্জের বড়লোক ব'লে বেশ একটু নাম-ডাক ছিল। বাজারে তাঁর একটা কাঠের আড়ত ও মাঝারী গোছের একটা কাপড়ের দোকানও ছিল। একদিন সেই কাপড়ের দোকানে নমঃশূদ্র-পাড়ার মধু গিয়েছিল কাপড় কিনতে। তখন যোগেন্দ্রবাবুর কর্ম্মচারী নিতাই খদ্দেরদের কাপড়-চোপড় দেখাচ্ছিল।

দু'-চারখানা কাপড় দেখার পর, মধু নমঃশূদ্রের সঙ্গে বিক্রেতা নিতাইয়ের কি একটা কথা নিয়ে ছোটখাটো বচসা হ'য়ে গেল।

যোগেন্দ্রবাবু সেই সময় দোকানে উপস্থিত ছিলেন। ছোটলোকের এতটা সাহস তিনি সহ্য করতে পারলেন না; তাই মধুর হাত থেকে কাপড়টা

ছিনিয়ে নিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে দোকান হ'তে বের ক'রে দিলেন।

বাজার-ভর্ত্তি লোকের মধ্যে কেউ যোগেনবাবুর কাজের প্রতিবাদ করলে না; কাজেই মধু নিরুপায় হ'য়ে কাঁদতে কাঁদতে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

সেই সময়ে শঙ্করের দলের একটি ছেলে বাজারে ছিল; গোলমাল শুনতে পেয়ে সে এগিয়ে গেল এবং মধুকে কাঁদতে দেখে সস্নেহে শুধালে—"কি হয়েছে তোমার মধু?"

মধু কাঁদতে কাঁদতে বললে—"আমার ছোট মেয়েটার আজ ক'দিন হ'তে খুব অসুখ। আজ ডাক্তারবাবু এসেছিলেন, বললেন—'আশা নেই।'

"মেয়েটা অসুস্থ হওয়া অবধি একটা লাল-পেড়ে শাড়ীর জন্য কেঁদে মরছে। ঘরে টাকা ছিল না, তাই অনেক ব'লে ক'য়ে হারুর কাছ থেকে আটগণ্ডা পয়সা ধার চেয়ে এনে বাঁড়ুজ্জে মশাইর দোকানে এসেছিলাম কাপড় কিনতে। নিতাই একটা ছেঁড়া

কাপড় দিয়েছিল, তাই বলনু—'এ কাপড়টা বদলিয়ে দে, নিতাই!' তা সে দিলে না, বরং গালাগালি দিতে লাগল। তাই বাবু, আমিও রেগে ক'টা উত্তর

ছেলেটিকে শুদ্ধ গালাগালি দিতে লাগলেন

দিলাম। বাঁড়ুজ্জে মশাই আমায় মেরে কাপড়টা কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিলেন।"

ছেলেটি ধীরভাবে মধুর কথা শুনলে, তারপর সান্ত্বনা দিয়ে বললে—"চল, আমি দেখছি।"

এই বিষয় নিয়ে কিছু বলতে যাওয়াতে ব্যাপারটা হিতে বিপরীত হ'য়ে গেল—যোগেনবাবু রেগে মেগে ছেলেটিকে শুদ্ধ যা-তা ক'রে গালাগালি দিতে লাগলেন।

শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়ে গেল। যোগেনবাবু তাঁর চাকরদের দিয়ে ছেলেটিকে সেই একবাজার লোকের মাঝে যথেষ্ট অপমান করালেন।···

যথাসময়ে শঙ্করকে এসব কথা জানান হ'ল। সমগ্র ব্যাপারটা আগাগোড়া শুনে, শঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে—"আচ্ছা!"

নয়

পরদিন দুপুরের পর অশ্বত্থতলায় শঙ্করের দলের ছেলেদের একটা জরুরী সভা বসল। হারু, ট্যাটন, শম্ভু, কালিদাস কেউই বাদ যায় নি—এমন কি, জমিদারের ছেলে রজতও উপস্থিত।

শম্ভু বললে—"এ কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না শঙ্কর। অত্যাচারী ধনীরা চিরকাল এমনি ক'রে গরীবদের জুতোর তলে থেঁতলে রাখবে—এ একেবারে অসহ্য! কেন—গরীবেরা কি মানুষ নয়? মানুষের চামড়া কি তাদের গায়ে নেই? তাদের দেহে কি ধনী বা বড়লোকদের মত রক্ত-মাংস নেই? চিমটি কাটলে কি তাদের ব্যথা লাগে না? এর একটা বিহিত করতেই হবে শঙ্কর!"—এই পর্য্যন্ত ব'লে শম্ভু একটু থামলে।

শম্ভুর পরে হারু বলতে সুরু করলে—"যে কাজ

বাঁড়ুজ্জে নিজ হাতে করতে পারতেন, তা অপরকে দিয়ে করালেন কেন? তিনি আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ আর পিতৃতুল্য ব'লে দু'ঘা বসিয়ে দিলেও দিতে পারতেন; তা না ক'রে, চাকরদের দিয়ে অপমান করালেন কেন? তাঁর এই অর্থের দম্ভ অসহ্য!

"তিনি যে আর দশজনের মতন ন'ন, সেটা বোঝাবার জন্যই তিনি হাট-ভর্ত্তি লোকের মাঝে চাকর দিয়ে অপমান করালেন। এ অপমান শুধু মধুকেই করা হয় নি—মধুর সম্প্রদায়ের সকলকেই অর্থাৎ গরীবদের করা হয়েছে।

"তাঁর এই ব্যবহারের ভিতর দিয়ে তিনি একথাটাই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, যে গরীব সে চিরদিনই নিঃস্ব—অসহায়। আর যিনি ধনী—যাঁর প্রচুর অর্থ আছে, তিনি চিরদিনই অজেয়।

"তিনি এটিও বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, ধনী ও দরিদ্রের এই যে আবহমান কালের মূলগত পার্থক্য একে অস্বীকার করা চলবে না; অস্বীকার করতে

এলেই তার প্রতিফল এই রকমটাই হবে।”—কথা ক’টি শেষ ক’রে হারু হাঁপাতে লাগল।

শঙ্কর এতক্ষণ একটা বড় শিকড়ের উপর ব’সে নীরবে সব কথা শুনছিল। হারুর কথা শেষ হ’তেই একটু মৃদু হেসে বললে—“এত উত্তেজিত হ’য়ো না ভাই। এখন কি করতে চাও তোমরা ?”

“প্রতিশোধ! প্রতিশোধ চাই।—এ অন্যায় জুলুম সহ্য করব না।”—সকলে সমস্বরে ব’লে উঠল।

শঙ্কর ধীরভাবে জবাব দিলে—“বেশ ত! কিন্তু কি উপায়ে প্রতিশোধ নেবে ? যোগেন বাঁড়ুজ্জের মত এমন প্রতিপত্তিশালী ধনী লোকের বিরুদ্ধে কি করতে পার তোমরা ? কতটুকু তোমাদের শক্তি ?”

“কিন্তু তাই ব’লে মধুর প্রতি এই যে অযথা অত্যাচার হ’য়ে গেল এর কি কোন প্রতিকারই হবে না ?—মুখ বুজে সব কিছু সহ্য করতে হবে ?”—ট্যাটন তীব্র ঝাঁজালু স্বরে

শঙ্কর ধীর-স্থিরভাবে বলতে লাগল—"ঠাণ্ডা হ'য়ে একটু ভেবে দেখ ভাই! হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ ক'রে ফেলা যুক্তিসঙ্গত নয়। মধুকে যখন আশ্বাস দিয়েছি তখন হ'তেই আমি ভাবছি এর কি প্রতিবিধান করা যেতে পারে।...

"ধনীর অর্থের কাছে দরিদ্রের এই যে আত্ম-বিক্রয়—এ অপমানের বিষ গরীবেরা হজম ক'রে আসছে যুগ যুগ ধ'রে। কিন্তু গরীবদের অপমানিত করবার অধিকার ধনীরা কোথা হ'তে পেলেন? আমি বলি তোমরা—যারা দীন-দরিদ্র—হতভাগ্য—প্রপীড়িত—এক কথায় বলতে গেলে, সভ্য-সমাজের আবর্জ্জনা—সেই তোমরাই তাঁদের এই অহমিকা, এই মিথ্যা আত্মম্ভরিতার মূল রস জুগিয়ে এসেছ তোমাদেরই বুকের রক্ত ঢেলে দিনের পর দিন। এতদিন যে জিনিসটা পেয়ে পেয়ে তাঁদের বুক হ'য়ে গেছে পাথরের মত কঠিন, আজ সেই বুক বেদনাতুরের শত অশ্রুতে ভিজেও নরম হবে না

ভাই! হাজার বছর ধ'রে যে জিনিসটা তাঁরা অর্জ্জন করেছেন এত সহজে কি তা ছেড়ে দেবেন?

"সমাজ হ'তে ধনী ও দরিদ্রের এই যে বৈষম্য—এই যে কুৎসিত পার্থক্য একে দূর করতে হ'লে চাই বঞ্চিত দরিদ্র-সম্প্রদায়ের বহু যুগের একনিষ্ঠ সাধনা ও কঠোর তপশ্চর্য্যা। তবেই মিলবে প্রতিষ্ঠা।... যেদিন কঠোর তপশ্চর্য্যার ফলে প্রত্যেক দরিদ্রের বুকে ভগবানের সাড়া মিলবে, সেদিন আর যোগেন বাঁড়ুজ্জের মত শত সহস্র ধনীর সাধ্য থাকবে না সঙ্ঘবদ্ধ দরিদ্রের শক্তিকে ঠেকিয়ে রাখতে। কাজেই আগে দরিদ্র হতভাগ্যদের জাগিয়ে তোল—তাদের নির্জীব দেহে সজীবতা এনে দাও, তবে ত মিলবে তোমাদের আজকের প্রচেষ্টার পূর্ণ সাফল্য।"

"তবে কি কোন প্রতিকারই আজ সম্ভব নয়?" —ক্ষীণস্বরে বললে রজত।

"শোন বন্ধুরা! আমি নিজে যোগেন বাঁড়ুজ্জের কাছে যাব। চাইব এই অন্যায় জুলুমের কৈফিয়ৎ।

আগে দেখি তিনি কি বলেন—তারপর দেখা যাবে।···এখনকার মত তোমরা বিদায় হও; বিকালে আবার আমার সঙ্গে দেখা ক'রো এখানে। তখন আমার মতামত জানতে পারবে তোমরা।" এই ব'লে, শঙ্কর ধীরপদবিক্ষেপে সে-স্থান ছেড়ে চ'লে গেল।

শঙ্কর চ'লে গেলেও ট্যাটন, শম্ভু প্রভৃতি কেউ সেই স্থান ত্যাগ করলে না। শঙ্করের মতের সঙ্গে তাদের কারও মত মেলে নি ব'লেই বোঝা গেল।

ট্যাটন বললে—"দেখ ভাই! এসব কোন কাজের কথা নয়। আমি বুঝি 'মাইট ইজ রাইট' (might is right) অর্থাৎ কিনা—'জোর যার, মুল্লুক তার।' তা ছাড়া ওই দাম্ভিক যোগেন বাঁড়ুজ্জে 'শক্তের ভক্ত, নরমের যম'।"

শম্ভু বললে—"ঠিক বলেছিস্ ট্যাটন। ও যেমন ত্যাঁদড় তাকে তেমনি লাঠি দিয়ে সোজা করব।··· তোরা সকলে প্রস্তুত থাকবি।"

রজত বললে—"শঙ্করের কথা তা হ'লে তোমরা শুনবে না ?"

"সে হ'তে পারে আমাদের দলের সর্দ্দার"—ট্যাটন বললে—"তাই ব'লে এক্ষেত্রে তার বিচার আদৌ ঠিক হয় নি।"

রজত আবার বললে—"তার মতের বিরুদ্ধে কিছু করলে শঙ্কর হয়ত খুব অসন্তুষ্ট হবে ভাই !"

"রেখে দে তোর সন্তুষ্ট আর অসন্তুষ্ট !··· নিজেও বড়লোক কিনা ! কি বুঝবি তুই গরীবের দুঃখ-বেদনা ?···সোনার বাটীতে যে আম-দুধ খায়, ডাঁটা-চচ্চড়ির আস্বাদ সে কি জানে ? যা—যা !" —তীব্রকণ্ঠে বললে ট্যাটন।

রজত ক্ষুণ্ণমনে বিদায় নিয়ে গেল। ওরা সকলে কিন্তু তখনও নানা জটলা পাকাতে লাগল।

———

দশ

শঙ্কর যখন বাঁড়ুজ্জে মশাইকে কথাটা বুঝিয়ে বলতে গেল, তখন তিনি রাগে দিশেহারা হ'য়ে উঠলেন; বললেন—"বেরিয়ে যা ডেঁপো ছোকরা! সেদিনের ছোকরা, ও এল আমায় তত্ত্ব-কথা বুঝাতে! কী এঁচড়ে পক্ক ডেঁপো ছেলেরে বাবা!"

শঙ্কর বিনীতস্বরে বললে—"কিন্তু আপনি বুঝছেন না বাঁড়ুজ্জে কাকা! মধু ত আপনার কাছে কোন দোষই করে নি; বরং আপনিই ত অযথা..."

বাঁড়ুজ্জে মশাই শঙ্করকে বাধা দিয়ে, যেন বোমার মত সশব্দে ফেটে পড়লেন—"কী—ফের তর্ক! মধু চাঁড়ালের মত গোটা দু'-তিন চড় না খেলে বুঝি শায়েস্তা হবি নে হতভাগা?"...

বাঁড়ুজ্জে মশাই আরও কত কি বলতে

লাগলেন ; কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে সে-সব কথা না শুনে, শঙ্কর পুচ্ছমর্দ্দিত সর্পের মত গর্জ্জাতে গর্জ্জাতে ফিরে এল। যথাসময়ে সে অশ্বত্থতলায় গেল, কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রেও সঙ্গীদের কারও দেখা পেলে না। ... ...

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন বেশ জমাট বেঁধে উঠেছে। একেই শীতের রাত্রি, তায় আবার আগের ক' দিন হ'তে দুর্জ্জয় শীত যেন সমগ্র গ্রাম-খানিকে কাঁপিয়ে তুলেছে !

সর্ব্বনাশী মধুমতীর ভাঙ্গনে গ্রামখানি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে অনেকখানিই স'রে এসেছে। এখন যেখানে নদীর জলস্রোত কল-কল ছল-ছল শব্দে আবর্ত্তের পর আবর্ত্ত রচনা ক'রে চলেছে, বছরখানেক আগে সেখানেই ছিল গ্রামের বাজার।

বাজার হ'তে একটা রাস্তা এঁকেবেঁকে নদীর ভাঙ্গা ও ফাটল-ধরা পাড়ের কিনারে কিনারে বাঁশবনের পাশ দিয়ে ঘুরে, মুসলমান-পল্লী ও

জেলে-পাড়ার ধার দিয়ে অনেকটা ঘুরে ফিরে এসে মিলেছে স্কুলের ধারের উঁচু সড়কের সঙ্গে। প্রকাণ্ড বাঁশঝাড়ের অর্দ্ধেকটাই প্রায় গত বর্ষায় রাক্ষসী মধুমতী গ্রাস করেছে। কাজেই পায়ে চলা রাস্তাটা বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়েই এগিয়ে গেছে।

শীতের আকাশ তখন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। জেলেরা সকলে পরদিন অতি প্রত্যূষে প্রাত্যহিক মাছ ধরতে যাবার সাজ-সরঞ্জামগুলো সাজিয়ে রাখছিল; তাদের মৃদু কথাবার্ত্তার দু'-একটি এলোমেলো টুকরো মাঝে মাঝে শোনা যায়।

তেমনি সময়ে দোকান বন্ধ ক'রে যোগেন বাঁড়ুজ্জে বাড়ী ফিরছিলেন; সঙ্গে তাঁর বেহারী চাকর। চাকরটি একহাতে লণ্ঠন ও অন্যহাতে একটা পাকা বাঁশের তেল-চক্‌চকে লাঠি নিয়ে তাঁর আগে আগে চলেছে।

অন্ধকারে ঢাকা বাঁশঝাড়ের কাছাকাছি আসতেই একটা লাঠি বিদ্যুদ্‌গতিতে এসে অগ্রবর্ত্তী

বেহারী ভৃত্যের লণ্ঠনটির উপরে প'ড়ে সেটিকে চূরমার ক'রে দিল। তারপরই চারদিক হ'তে সমপর্য্যায়ে ও সমান বেগে লাঠি এসে বাঁড়ুজ্জে মশাইর মাথায়, পিঠে আর কাঁধে পড়তে লাগল বেপরোয়া-ভাবে।

বাঁড়ুজ্জে মশাই প্রথমটা অত্যন্ত হকচকিয়ে গেছিলেন ; পরক্ষণেই লাঠির সুমধুর আস্বাদ পেতেই প্রাণভয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন—"ওরে বাবারে! মেরে ফেললেরে! ওরে নিধুরে—'জান' নিলেরে! খুন করলেরে!"...

ততক্ষণে বেহারী ভৃত্যটি বেগতিক দেখে ছুটতে ছুটতে গিয়ে, সেই শীতের রাত্রেও স্রোতোময়ী মধুমতীর শীতল জলে আত্মসমর্পণ করল।

এগার

পরদিন সকালে গ্রামে যেন একটা খুব সোর-গোল প'ড়ে গেল। কি ব্যাপার ? ব্যাপার আর কিছু নয়—বাঁড়ুজ্জে মশাইকে নাকি কা'রা কাল রাত্রে নদীর ধারে ভয়ানক মার দিয়েছে। ভদ্র-লোকের নাকি আর উঠে বসবারও ক্ষমতা নেই। তাঁরই একজন মুসলমান প্রজা রাত্রে সেই পথ দিয়ে ফিরছিল ; তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় অজ্ঞান হ'য়ে রাস্তায় প'ড়ে থাকতে দেখে সে গাঁয়ে এসে সকলকে খবর দেয়।

ব্যাপারটা আশ্চর্য্য বটে। বাঁড়ুজ্জে মশাইর মত অমন প্রতিপত্তিশালী একজন লোককে এমনি-ভাবে মেরে গুঁড়ো ক'রে দিয়ে গেল ! গ্রামের মাঝে এমন বুকের জোর কার ?

মাতব্বরেরা মাথা নেড়ে বললেন—"তাই ত ! কালে কালে হ'ল কি ?—অ্যাঁ !"

রজনী নামে এক ভদ্রলোক বললেন—"এ এক রকম ভালই হ'ল। বেটার বড় বাড় বেড়েছিল, তেলটা এবার একটু কমবে। টাকার জোরে ধরাকে সরা জ্ঞান করছিল—মানুষকে একেবারে শেয়াল-কুকুরের মতই দেখছিল!"...

গ্রামে পুলিশ এল। 'যত দোষ নন্দ ঘোষ', অর্থাৎ ঐ শঙ্করের দলকেই নাকি বেশী সন্দেহ হয়—একথা বাঁড়ুজ্জে মশাই স্পষ্টই দারোগাকে জানিয়ে দিলেন। কাজেই শঙ্করদের আড্ডায় হানা দিয়ে শঙ্কর, হারু, ফণী, শম্ভু প্রভৃতি চার-পাঁচজনকে পুলিশ ধ'রে নিয়ে গেল।...

শৈল এসে জাহ্নবী দেবীর কাছে কেঁদে পড়ল— "জ্যেঠাইমা, শঙ্কুকে বাঁচান।"

সস্নেহে শৈলর মাথায় হাত বুলিয়ে জাহ্নবী দেবী বললেন—"আমি সবই শুনেছি শৈল, তুই বাড়ী যা। যার চোখ দিয়ে এমনি ক'রে পরের দুঃখে জল ঝরে, তার জন্য ভগবানও যে কাঁদেন মা। তোর কোন

ভয় নেই। শঙ্করের ত কোন পাপ নেই, সে তোর বুকেই আবার ফিরে আসবে।"

শৈল বললে—"কিন্তু তা'রা ত সে-কথা বুঝবে না জ্যেঠাইমা।"

জাহ্নবী দেবী আশ্বাস দিয়ে বললেন—"তোর জ্যেঠাইমা ত এখনও ম'রে যায় নি শৈল। এই ত সেদিন সে আমার ছেলের প্রাণ আমার হাতে তুলে দিয়ে গেল, সে-কথা আর কেউ ভুললেও আমি ত ভুলতে পারব না মা! আমি যে মা। শঙ্কর আর রজত ত আমার কাছে পৃথক্ নয়।"...

রজতের বাবাই নিজে জামীন হ'য়ে শঙ্কর প্রভৃতিকে খালাস ক'রে নিয়ে এলেন। কয়েকদিন পরে বিচার হ'ল। কিছু জরিমানা দিয়ে শঙ্করেরা সকলে সেবারের মত রেহাই পেল।

এই ব্যাপারের পর হ'তে শঙ্কর যেন আশ্চর্য্য রকমের শান্ত হ'য়ে গেল। দিবারাত্রি সে নিজের পড়ার বই নিয়ে মেতে রইল।

যথাসময় টেষ্ট্ পরীক্ষাও হ'য়ে গেল।

আশ্চর্য্য! সত্যই সকলে একেবারে থ' হ'য়ে গেল—যখন শঙ্কর পরীক্ষায় প্রথম হ'য়ে সব বিষয়েই খুব ভাল ভাল নম্বর পেল। স্কুলের মাষ্টার মশায়েরা যাঁরা এত দিন শঙ্করকে 'অপদার্থ', 'গুণ্ডা', 'কিছু কোন দিনও হবে না' ব'লে মতামত প্রকাশ ক'রে এসেছেন, তাঁরাই এখন বলতে লাগলেন—"আরে এ তো জানাই ছিল, ওর মত ছেলে যদি একটু পড়ে তবে ওকে পায় কে? নেহাৎ এতদিন পড়ে নি ব'লেই না..."

একদিন পথে রজনী কাকার সঙ্গে শঙ্করের দেখা হ'তেই তিনি বললেন—"এই যে বাবা শঙ্কর! শুনলাম, তুমি নাকি এবার পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হয়েছ।...আরে এ তো জানা কথাই, তুমি ভাল হবে না ত কি আমার হেবোটা ভাল হবে?"

শঙ্কর একটু হাসলে। কেননা এই কিছুদিন আগেও ত এই রজনী তাঁর ছেলে হেবোর সঙ্গে

তাকে তুলনা ক'রে বলেছিলেন, "ওটির আর কিছু হবে না, চিরকাল ওই রকম গুণ্ডামি ক'রেই খেতে

হবে।" শঙ্কর সে-কথা ভেবে হাসলে ও ভক্তিভরে রজনীর পায়ে প্রণাম ক'রে নিজের কাজে চ'লে গেল।

শঙ্কর কিছুতেই বুঝতে পারছিল না যে, দু'দিন আগেও যারা তাকে দু'চোখে দেখতে পারত না হঠাৎ তা'রা কেন এমনি বদলে গেল ? কিন্তু এত প্রশংসা,

এত অভিনন্দন এসব আর শঙ্করের যেন মোটেই ভাল লাগছিল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল এসব ত সে কোন দিনও চায় নি। 'ভাল ছেলে হব' এবং ভাল ছেলে হ'য়ে সকলের প্রশংসা ও আদর কুড়িয়ে বেড়াবার মত ইচ্ছাও ত তার কোন দিন হয় নি। তবে ?...চিরকাল 'মন্দ', 'ডানপিটে' হ'য়ে থাকতেই ত সে চেয়েছিল ! যেখানে যায় সেখানেই তার প্রশংসা। 'ভাল ছেলে, ভাল ছেলে' শুনতে শুনতে সে যেন হাঁপিয়ে উঠতে লাগল।

শঙ্করের বিষণ্ণ মুখখানা দেখে শৈল একদিন তাকে শুধালে—"তোর কি হয়েছে শঙ্কর—দিনরাত এমন মুখ ভার ক'রে থাকিস্ কেন ?"

শঙ্কর একটুখানি হেসে জবাব দিলে—"কৈ কিছু ত হয় নি দিদি !"

বার

পরীক্ষার আর মাত্র দিন দশেক বাকী আছে। এমন সময় একদিন পড়ার বইগুলো বুজিয়ে রেখে, শঙ্কর রান্নাঘরের দাওয়ায়—শৈল যেখানে কুটনো কুটছিল সেখানে এসে দাঁড়িয়ে, ডাকলে—"দিদি!"

—"কেনরে শঙ্কু?"

—"পরীক্ষা আর দেব না ঠিক করলাম।"

প্রথমটা শঙ্করের কথা যেন মোটেই বুঝতে পারে নি এমনি ভাবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শৈল বললে—"পরীক্ষা দিবি না—মানে?"

—"না দিদি, সত্যিই পরীক্ষা দেব না।"

—"আমি ত তোর কথা কিছুই বুঝতে পারছি না শঙ্কর!"

—"এর মধ্যে আর বোঝা-বুঝির কি আছে দিদি? পরীক্ষা দেব না, ব্যস্! লেখাপড়া ত

যথেষ্টই শেখা হ'ল। একজন লোকের পক্ষে এর চাইতে বেশী লেখাপড়া আর না শিখলেও চলবে।"

—"তবে চিরটা কাল মূর্খ হ'য়েই থাকবি?"

—"যে দেশের অর্দ্ধেকের বেশী লোকে নিজের নামটা পর্য্যন্ত লিখতে জানে না—যারা বর্ণমালার প্রথম অক্ষরটি পর্য্যন্ত পড়তে জানে না তাদের এই যথেষ্ট। এর বেশী আর দরকার নেই।

"আমি যেটুকু শিখেছি, আমার মনে হয় সেটুকু যদি না ভুলি তবেই হ'ল।"... ...

স্কুলের ছেলেরা সকলেই শুনল যে, শঙ্কর পরীক্ষা দেবে না।

একদিন পথে হেডমাষ্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা হ'তেই তিনি বললেন—"এই যে শঙ্কর, পরীক্ষাটা নাকি দেবে না শুনলাম।"

—"না স্যার, পরীক্ষা দেবই না ঠিক করেছি!"

—"কেন?"

—"আপনার আশীর্ব্বাদে আর ভগবানের দয়ায়

যা শিখেছি সে-ই আমার পক্ষে যথেষ্ট স্যার! এর চাইতে বেশী কিছু আমি আশাও করি না—আকাঙ্ক্ষাও করি না।"

—"দু'-একটা পাশ না করলে ভাল চাকরীও ত তোমার জুটবে না।"

—"যে লেখাপড়া বা পাশের আসল উদ্দেশ্যই হ'ল চাকরী করা, সে-রকম পাশ আমি করতে চাই না স্যার! আমি মূর্খ হ'য়েই সকলের এক পাশে প'ড়ে থাকতে চাই। আপনার অনেক ছাত্রই তো বিদ্বান হ'য়ে আপনার শিক্ষার সার্থকতা বজায় রাখবে আর আমি না হয় চিরকাল এমনি মূর্খ হ'য়েই থাকব। এক মায়ের সব ক'টি ছেলেই ত সমান হয় না স্যার!"

—"লেখাপড়া শিখলে না, কিন্তু এখন তুমি কি করবে ঠিক করেছ?"

—"আমি যেটুকু শিখেছি, যেটুকু বুঝেছি, আমার দেশের মূর্খ ভাই-বোনদের সেইটুকুই শেখাব

এবং সেটা ততক্ষণই সম্ভব হবে যতক্ষণ না আমি ওদের থেকে বেশী দূরে স'রে যাই।...

"দেশের সব ছেলেই যদি পাশ ক'রে 'জজ, ব্যারিষ্টার' হ'তে চায় তবে ওদের কে দেখবে স্যার ? ওদের দেখবার যে কেউ নেই। ওরা যে বড় দুঃখী। আশীর্ব্বাদ করুন স্যার, যেন ওদের দুঃখ বুঝতে শিখি—ওদের তরে কাঁদতে পারি।"

শঙ্করের কথায় হেডমাষ্টার মশায়ের চোখ দুটি জলে ভ'রে এল। তার মাথায় হাত দিয়ে গভীর স্নেহমাখা সুরে তিনি বললেন—"আশীর্ব্বাদ করছি শঙ্কর, তুমি সফল হ'ও। তোমার বুকে যে ভগবান আছেন বাবা, তিনিই তোমায় যশের উচ্চ শিখরে তুলে ধরবেন। তোমার কথা শুনে, আজ আমার সত্যই গর্ব্ব হচ্ছে যে, তোমার মত অন্ততঃ একটি ছেলেও আমার হাত দিয়ে বেরিয়েছে। যে শিক্ষার আলো তুমি পেয়েছ, সে শিক্ষা তোমার বইয়ের শিক্ষার চাইতেও অনেক বড় ও বেশী।"

শঙ্করের চোখ দুটিও জলে ভ'রে এল। সে গভীর ভক্তিভরে নত হ'য়ে হেডমাষ্টার মশায়ের পায়ের ধূলো নিল।

শৈল থেকে আরম্ভ ক'রে সকলেই ভেবেছিল শেষ পর্য্যন্ত শঙ্কর পরীক্ষাটা দেবে; কিন্তু সে পরীক্ষা দিলে না।

পরীক্ষার দিন সকালবেলায় যখন সকলে যাত্রার জন্য নদীর ঘাটে এসে দাঁড়াল, তখন শঙ্করও সেই সাথে সকলকে বিদায় দিতে এল। হেসে হেসে সকলের সাথেই সে কথা বলছিল। যাদের সাথে সে কোন দিন একটা কথা পর্য্যন্ত বলে নি, তাদের কাছে এগিয়ে গিয়েও সে বললে —"তোদের সাফল্য কামনা করি ভাই! ভাল ভাবে সব পাশ ক'রে ফিরে আয়।"

রজত শঙ্করের একখানা হাত ধ'রে বললে— "চল না ভাই, পরীক্ষাটা দিবি।"

শঙ্কর সহাস্যে বললে—"তা আর হয় না রে।"

বাড়ীতে ফিরে আসতেই ছল-ছল চোখে দিদি শুধালে—"সত্যিই পরীক্ষাটা দিলি না শঙ্কর!"

কথা ক'টি বলার সাথে সাথে টপ্-টপ্ ক'রে কয়েক ফোঁটা অশ্রু দিদির দু' চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। সহসা শঙ্করের প্রাণটাও যেন কেমন ক'রে উঠল। সে ধীরে ধীরে দিদির কাছে এগিয়ে এসে ধরা গলায় ডাকলে—"দিদি!"

—"কেন রে শঙ্কু?"

—"সত্যিই তোমার খুব দুঃখ হয়েছে দিদি, আমি পরীক্ষা দিই নি ব'লে? তবে বল এখুনি নৌকো বেয়ে গিয়ে আমি পরীক্ষা দিয়ে আসি।"

সস্নেহে শঙ্করের মাথায় একখানা হাত রেখে দিদি বললে—"দরকার নেই শঙ্কর! তোর মন যাতে সায় দিয়েছে, হয়ত সেটাই ঠিক। তবে এত কষ্ট ক'রে পড়াশুনা করলি, সকলেই বলছিল বৃত্তি পাবি। তাই..."

—"তবে যাই, পরীক্ষাটা না হয় দিয়েই আসি।"

শঙ্করের একখানা হাত ধ'রে নিজের কাছে টেনে এনে দিদি বললে

শঙ্করের একখানা হাত ধ'রে নিজের কাছে টেনে এনে দিদি বললে—"ওরে না না—থাক। পরীক্ষা না হয় না-ই দিলি।"

—"তা হ'লে বল এই পরীক্ষা না দেওয়ার জন্য তোমার মনে আর কোন দুঃখ নেই, কোন কষ্ট নেই।"

দিদি হেসে বললে—"না-রে না!" ...

পরীক্ষা দিয়ে সব ফিরে এল। সেদিন পথে শঙ্করের সঙ্গে সত্যবানের দেখা হ'য়ে গেল। সত্যবান বললে—"এই যে শঙ্কর, শুধু শুধু পরীক্ষাটা কেন যে দিলে না ভাই! পরীক্ষা খুবই সোজা হয়েছিল, তোমার যেমন তৈরী ছিল তাতে হয়ত খুব ভালই করতে।"

হাসতে হাসতে শঙ্কর বললে—"যে চিরদিন লাষ্ট বয়, সে দু' দিনের জন্য ফার্ষ্ট বয় হ'য়ে গেলেই কি সে ফার্ষ্ট বয় হ'য়ে যাবে ভাই? তা হয় না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তুমি যেন ফার্ষ্ট হ'তে

পার। তা হ'লেই আমারও ফার্ষ্ট হওয়া হবে। আমি নিজে না হয় না-ই বা হলেম।"

শঙ্কর চ'লে গেল। তার গমনপথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সহসা সত্যবানের চোখের কোল দুটো ভিজে গেল। আজ বহুদিন পরে শঙ্করের আসল রূপটা ওর চোখে ফুটে' উঠল—একটা কালো পর্দ্দা যেন ওর মনের উপর হ'তে স'রে গেল। সে কান্না-ভরা গলায় মনে মনে বললে, 'আমি এতদিন অন্ধ ছিলাম শঙ্কর, তাই তোমায় চিনতে পারি নি। কিন্তু আজ বুঝেছি তোমায় আমায় আসল পার্থক্য কোথায়! আজ জেনেছি তুমি আমার চেয়ে কত বড়—আর আমি কত ছোট!' দুই চোখের কোণ বেয়ে দু' ফোঁটা অশ্রু যেন নীরবে শঙ্করকেই প্রণতি জানালে।

তের

গ্রামের অশিক্ষিত নমঃশূদ্রদের নিয়ে শঙ্কর একটা নৈশ স্কুল আরম্ভ ক'রে দিল। হেডমাষ্টার মশাই শঙ্করের এই উৎসাহ ও চেষ্টা দেখে স্কুলের একটা ঘর তাকে ছেড়ে দিলেন।

প্রথম প্রথম দু'একজন ছাত্র মিলল, কিন্তু তা'রাও আবার দু'চার দিন যেতে না যেতেই স'রে পড়তে লাগল। তখন শঙ্কর নিজে সকলের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের অনেক ক'রে বুঝাতে চেষ্টা করল। রাতের পর রাত অক্লান্ত পরিশ্রমে সকলের বাড়ী বাড়ী গিয়ে সে বলতে লাগল—"ভাই সব, তোমাদের আমি উপকার করতেই চাই। তোমরা যে কুকুর-বেড়াল নও, তোমরাও যে মানুষ, তোমাদেরও যে অনুভব করবার ক্ষমতা আছে—আঘাত করলে তোমাদের শরীরেও আমাদের শরীরের মতই ব্যথা লাগে, একথাটা কেন তোমরা ভুলে যাও?"

তা'রা দেখলে—এ এক নূতন জিনিস বটে; এমন কথা ত কেউ কখনও তাদের বলে নি! যারা চিরকাল তাদের দূর্-দূর্ ক'রে এসেছে তাদেরই একজন এখন তাদের 'ভাই' ব'লে ডাকছে! এ কি কম আশ্চর্য্যের কথা!...

ডাকার মত ডাকতে জানলে বনের পশুও সাড়া দেয়, মানুষ ত কোন্ ছার! শঙ্করের স্নেহের আহ্বানে তা'রা দু'দিনেই তার কাছে ছুটে এল।...

নদীর ওপারে ছিল একটা পাটের কল। গ্রামের অধিকাংশ লোক্ই সেখানে খাটতে যেত। ভদ্রলোক থেকে আরম্ভ ক'রে তাঁতী, তেলী, নমঃশূদ্র সকলেই সেখানে যেত। সারাটা দিন খুব বেশি পরিশ্রম ক'রে তা'রা ক্লান্ত হ'য়ে পড়ত; তাই ইচ্ছা থাকলেও শঙ্করের স্কুলে আসতে পারত না, কিন্তু শঙ্কর তাদের হৃদয়ের এমন একটা জায়গায় আঘাত করেছিল যে, তা'রা শেষে আর না এসে থাকতে পারলে না। সমস্ত অবসাদ-ক্লান্তিকে

একপাশে সরিয়ে রেখে রাতের পর রাত তা'রা শঙ্করের কাছে ছুটে আসত।

'একদিন এই বাঙলার বুকেই ধনে জনে কেমন সুখের হাওয়া বইত—একখানা সর্ব্বদা ব্যবহারের কাপড়ের বা খাদ্যদ্রব্যের জন্যও কাউকে দোকানে ছুটতে হ'ত না। আজকালকার মত সকলের ঘরে ঘরে রোগ-ব্যাধি রোজ রোজ লেগে থাকত না। লোক ছিল সুস্থ সবল। যাদের পূর্ব্বপুরুষ একদিন পঞ্চাশ বছর বয়সেও মাত্র একখানা লাঠি নিয়ে অনায়াসে একটা বাঘের কবল হ'তে নিজকে বাঁচিয়ে আসত, আজ তা'রাই একটা শেয়ালের ডাকে কেমন ক'রে আঁৎকে উঠে।...

যে বাঙলার ঘরে আগে অন্নের অভাব ছিল না—উঠোনে মড়াইভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ থাকত, আজ সেই বাঙলার ঘরের দিকে চাইলে চোখ জলে ভ'রে আসে কেন?'...

এই সব কথা তা'রা মন দিয়ে শুনত।

শঙ্কর

শঙ্কর একদিন শৈলকে বললে—"শুধু শুধু এমনি ক'রে আর ঘরের ভাত নষ্ট করতে মন চায় না দিদি! আমি ভাবছি একটা কিছু কাজ করব।"

দিদি সে-কথার জবাবে কোন কথাই বললে না। তার কিছুদিন পরেই শঙ্কর মিলে গিয়ে কাজে ভর্ত্তি হ'য়ে এল।

দিদি আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে বললে—"ঘরে কি সত্যিই তোর কিছুর অভাব হয়েছিল শঙ্কর?"

শঙ্কর হাসতে হাসতে বললে—"মানুষ কি শুধু অভাবের জন্যই চাকরী করে দিদি?"

প্রথম হপ্তার মাইনেটা যখন শঙ্কর দিদির হাতে এনে দিল, তখন দিদি যেন আর নিজকে সামলাতে পারলে না—কেঁদে ফেললে।

দিদি বললে—"শেষকালে এই চার টাকা হ'ল তোর বেতন, আর এও আমায় দেখতে হ'ল!"

শঙ্কর বললে—"ওঃ আজও তোমার মন হ'তে শিক্ষার গর্ব্বটা যায় নি দিদি ?"

দিদি বললে—"এ কাজ তুই ছেড়ে দে শঙ্কর।

আমাদের দুটি মাত্র পেট। যা আছে তাতেই ত আমাদের বেশ চ'লে যাচ্ছিল ভাই !"

শঙ্কর কোন কথাই বললে না, শুধু মাথা নীচু ক'রে নীরবে সেখান হ'তে চ'লে গেল।

পরের হপ্তার বেতন শঙ্কর ঘরে আনলে না। শৈল তার কারণ জিজ্ঞেস করলে শঙ্কর জবাব দিল—"আবদুল মিস্ত্রীর ছোট ছেলেটার আজ ক'দিন হ'তেই ভারি অসুখ দিদি! বেচারা মাত্র আট আনা হপ্তা পায়; তাতে সে সংসারই বা চালায় কি দিয়ে, আর ছেলের চিকিৎসাই বা করায় কি ক'রে? ডাক্তারের কাছে বিস্তর দেনা; আগের দেনা শোধ না করলে তিনি আর আসবেন না বলেছেন; তাই তাকেই এ হপ্তার টাকা ক'টা দিয়ে এলাম দিদি!"

—"আহা তবে ত তার বড় দুঃখ রে!"

—"হাঁ দিদি, সত্যই সে বড় গরীব।"

... ...

পরের দিন মিল থেকে একটু অধিক রাত্রে শঙ্কর বাড়ী ফিরলে দিদি শুধালে—"আজ তোর এত দেরী হ'ল কেন শঙ্কর?"

শঙ্কর বললে—"আবদুলের ছেলেটা আজ দুপুরে

মারা গেল দিদি! তাকে কবর দিয়ে এই ত ফিরছি!...উঃ ছেলেটার মার কি কান্না—সে যদি তুমি শুনতে দিদি! তার কান্না শুনলে পাষাণও বুঝি গ'লে যায়! আর বাঁচেই বা কেমন ক'রে? বুক জুড়ে নিউমোনিয়া ব'সে গেছে; স্যাঁৎসেতে আর অন্ধকার ঘর। সেখানে সুস্থ মানুষই অসুস্থ হ'য়ে উঠে, আর সে ত রোগী!"

দিদি দেখলে শঙ্করের চোখের কোণে জল—প্রদীপের আলোয় চিক্‌চিক্ করছে।

এমনি ক'রেই ভাই-বোনের দিনগুলো একভাবে কেটে যাচ্ছিল।...

একদিন রাত্রে মিল হ'তে শ্রান্ত হ'য়ে ফিরে এসে শঙ্কর সবেমাত্র শুয়েছে, এমন সময় কা'র কান্নার শব্দ অন্ধকারের বুকে জেগে উঠল। সে ধড়ফড় ক'রে বিছানায় উঠে' বসল।

শৈল জেগেই ছিল; ভাইকে উঠে' বসতে দেখে উদ্বিগ্নভাবে শুধালে—"কি হ'ল রে শঙ্কু?"

শঙ্কর বললে—"পুষ্পাদের বাড়ী হ'তে কান্নার শব্দ আসছে না ?"

"হয়ত কিছু বিপদ-আপদ ঘটে' থাকবে।"—জবাব দিলে শৈল।

"আমি যাই।"—ব'লে, শঙ্কর বিছানা ছেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

শৈল শুধালে—"কোথায় যাচ্ছিস্ ?"

"পুষ্পাদের ওখানে।"—ব'লে, শঙ্কর দরজা খুলে অন্ধকারে নেমে পড়ল।

"ও শঙ্কু, শোন শোন !"—বলতে বলতে শৈলও শয্যা ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

সে-বাড়ীতে গিয়ে ওরা দেখলে পুষ্পর বাবা রামতারণবাবু একেবারে জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়েছেন। বিকালের দিকে তাঁর বার কয়েক ভেদ বমি হয়েছিল। বাড়ীতে লোকের মধ্যে পুষ্পার এক বিধবা পিসিমা ; তিনিও আবার বাতে পঙ্গু। যে চাকরটা ছিল সেও রোগ দেখে কোথায় স'ড়ে পড়েছে। ডাক্তার

ডেকে আনবে এমন একটি লোক পর্য্যন্ত নেই। ওদের দেখে পুষ্প হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে উঠল।

শৈল সস্নেহে পুষ্পকে বুকের উপর টেনে নিয়ে স্নিগ্ধস্বরে বললে—"ভয় কি ভাই! তোমার বাবা এখুনি ভাল হ'য়ে উঠবেন।"

শঙ্কর তখনই গ্রাম থেকে তিন মাইল দূরবর্ত্তী সহরে গিয়ে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এল। কিন্তু রামতারণের অবস্থা তখন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে; অস্পাষ্টভাবে গোটা দুই কথা উচ্চারণ ক'রে বুড়ো শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

পুষ্প বিলাপ করতে করতে পিতার বুকের উপর লুটিয়ে পড়ল। শঙ্কর নীরবে দাঁড়িয়ে শোকাচ্ছন্ন পুষ্পর বুকভাঙ্গা কান্না শুনতে লাগল। তারও দু'চোখের কোল বেয়ে ফোঁটার পর ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে তার জামা ভিজিয়ে দিল।

পুষ্পর ঐ এক মাত্র পিসি ছাড়া বাপ কিংবা মায়ের দিক দিয়ে আর কোনই আত্মীয় ছিল না।

পুষ্পর পিসিমা শঙ্করের হাত ধ'রে বললেন—"তুমি যদি বাবা, পুষ্পর জায়গা-জমিগুলো একটু দেখা-শোনা কর এবং সেই সঙ্গে ওর দিকেও একটু চেয়ে দেখ। এ সংসারে ওর আর কেই বা আছে? ও বড় দুঃখী বাবা!"

সজলচোখে শঙ্কর জবাব দিলে—"ও-সব কথা ব'লে কেন আমায় আর লজ্জা দিচ্ছেন পিসিমা! পুষ্প আমার ছোট বোনেরই মত। আপনি না বললেও আমি ওকে দেখতাম।"

সেই দিন হ'তে শঙ্কর নিজের কাজ ক'রে বাকী সময়ে পুষ্পর কাজকর্ম্মে মেতে থাকত। গ্রামের লোকেরা নানা জনে নানা কথা বলতে লাগল। কিন্তু শঙ্কর কথায় দমবার ছেলে কোন দিনই ছিল না—আজও সে তাদের কথায় একটুও বিচলিত হ'ল না। নিজের কর্ত্তব্য সে ক'রে যেতে লাগল।

শঙ্কর জানত এ দুনিয়ায় পরের দুঃখে বুক পেতে দাঁড়াবার মত শক্ত মেরুদণ্ড খুব কম লোকেরই

আছে। মৌখিক সহানুভূতি ও দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলতে হয়ত লোকের অভাব হয় না; কিন্তু তাতে ক'রে যে সত্যিকারের ব্যথার স্থানে আরও আঘাত লাগে, সে-কথাটা কেউ বোঝে না। একজন ব্যথিতকে যে অন্যের কাছে হাত পাততে হচ্ছে এইটাই ত তার সর্ব্বাপেক্ষা লজ্জা ও দুঃখের কথা। এর উপরও আবার আর একজন যদি সেই ব্যথা দূর করবার ভান ক'রে শুধুমাত্র তার ব্যথাটা উপভোগ করবার জন্যই সহানুভূতির মুখোস এঁটে এসে তাকে বিব্রত ক'রে তোলে, তবে সে বাঁচে কি ক'রে?...

অভাগিনী পুষ্প যে অতি বড় দুঃখী—আজ এই দুনিয়ার দরবারে তার মুখের দিকে চাইবার যে কেউ নেই! কথাটা গ্রামের সকলে ভুলে গেলেও শঙ্কর বা তার দিদি শৈল ভুলে যায় নি। তাই তা'রা দুটি ভাই-বোনে সকলের হাসি-বিদ্রূপকে একপাশে ঠেলে দিয়েছিল।

সেদিন সাঁঝের বেলায় তুলসীমঞ্চে মাটির প্রদীপটি

দিয়ে পুষ্প যখন ভগবানের পায়ের তলায় প্রণতি জানাচ্ছিল, শঙ্কর এসে তখন সাম্‌নে দাঁড়াল এবং পুষ্পর দেখাদেখি সেও মাটিতে মাথা নোয়ালে।

পুষ্প যখন মুখ তুললে, তার দুটি গণ্ড বেয়ে অশ্রুর ধারা প্রদীপের ম্লা'ন আলোতে চক্‌চক্‌ করছিল।

শঙ্কর শুধালে—"তুমি কাঁদছিলে কেন পুষ্প ?"

—"দুঃখীর অশ্রুর তো বিরাম নেই শঙ্কুদা' !"

—"মা-বাপ কি কারও চিরদিন বেঁচে থাকে পুষ্প ? তাঁর কাজ শেষ হয়েছে, তিনি চ'লে গেছেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা মুহূর্ত্তও এখানে থাকবার কারও হুকুম নেই—ভগবানের রাজ্যের এমনি বিধান !...আর দুঃখের কথা বলছ, তোমার এই সামান্য দুঃখটাকেই তুমি আজ এত বড় ক'রে দেখছ পুষ্প ? তোমার চারদিকে একটিবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দেখি ; দেখবে দুঃখকে বাদ দিয়ে এখানে একটি পাও কারও চলবার উপায় নেই। যিনি তোমায় দুঃখ দিয়েছেন, তিনিই তোমার এ দুঃখ সইবারও ক্ষমতা দেবেন। তোমাকে আমি শনিবার এক জায়গায় নিয়ে যাব। দেখবে কত দুঃখ মানুষের হ'তে পারে !"

তারপর সংসারের আবশ্যক আরও দু'-চারটে কথা ব'লে শঙ্কর বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল।

চৌদ্দ

পরের শনিবার শঙ্কর নিজেই নৌকো বেয়ে শৈল ও পুষ্পকে নিয়ে নদীর ওপাড়ে কুলী-বস্তিতে গেল।

মিলের সংলগ্ন প্রায় সিকি মাইল জায়গা জুড়ে কুলী-বস্তি। টালির সেড্ দেওয়া এবং দরমা ও টিনের বেড়ায় ঘেরা ছোট ছোট খুপড়ীঘরে বস্তিটি ভরা।

আলোর সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। যে অবারিত সূর্য্যের আলো ঘাটে মাঠে বাটে, ধনীর প্রাসাদচূড়ায় এবং দরিদ্রের পর্ণকুটীরে বিধাতার আশীর্ব্বাদরূপে অফুরন্ত সোহাগ বিলিয়ে দেয়, সেখানের টিনের বেড়ার গায়ে এবং টালির সেডের উপরে মাথা খুঁড়ে সেই সূর্য্যালোকও ফিরে যায়।

ছোট ছোট খুপড়ীঘরগুলো অপরিসর এবং নোংরা। সমগ্র বস্তিটি একেবারে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন।

গোলমাল, চেঁচামেচি, কান্নাকাটি আর হাজার রকমের হট্টগোল সেখানে লেগেই আছে সর্ব্বক্ষণ।

হাজার হাজার কুলী দিনের পর দিন সেখানে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বসবাস করছে।

শৈল চারদিকে তাকাতে তাকাতে ব্যথাভরা স্বরে বললে—"এখানে মানুষ থাকে কি ক'রে রে শঙ্কর ?"

"কাদের তুমি মানুষ বলছ দিদি ?"—শঙ্কর জবাব দেয় ; "এরা কি মানুষ ? এরা মানুষের কঙ্কাল !... যন্ত্রদানবের কল্যাণে আজ এরা সব এক-একটি ছোটখাটো যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। দয়া, মায়া, বা ভালবাসা—কিছুই নেই এদের ; আছে শুধু সর্ব্ব-গ্রাসী ক্ষুধার তীব্র জ্বালা !"

"মানুষের এত দুঃখ ! ভগবান কি দেখেন না শঙ্কুদা' ?"—কান্নাঝরা সুরে বলে পুষ্প।

—"ভগবানের কোন দোষ নেই এতে পুষ্প !... ভগবান সৃষ্টি ক'রে এদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন ;

এদের মাথায় দিয়েছেন চিন্তাশক্তি, আর হাতে পায়ে কর্ম্মশক্তি। এরা যদি সেগুলোর সদ্ব্যবহার না করতে পারে তাতে ভগবানের দোষ কি ?”

কথা বলতে বলতে তা’রা এগিয়ে চলল। চলতে চলতে তা’রা একটা খুপড়ীঘরের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াল।

ঘরের দরজায় একটা আধভাঙ্গা কবাট—তাতে চটের পর্দ্দা ঝুলছে। ঘরের ভিতরে জ্বলছিল একটা অস্পষ্ট আলো।

দরজায় দাঁড়িয়ে শঙ্কর ডাকলে—“অতসীর মা, বাড়ী আছ গা ?…বদন !—ও বদন !”

“কে গা ?”—ক্ষীণ প্রত্যুত্তর এল।

—“আমি শঙ্কর, অতসীর মা !”

—“ওঃ—দেবতা !…আসছি—একটু দাঁড়ান।”

একটা কেরোসিনের আলো হাতে নিয়ে একজন শীর্ণা প্রৌঢ়া চটের-পর্দ্দার ওধার হ’তে সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। তার কঙ্কালসার ধূলি-মলিন চেহারা দেখে

মনে হয় যেন প্রেতলোক হ'তে কোন এক প্রেতিনী ক্ষুধার জ্বালায় বেরিয়ে এল। এগিয়ে এসে সেই প্রৌঢ়া বললে—"দেবতা! কেমন আছেন দেবতা?"

মিলের কুলী-মজুরেরা শঙ্করকে 'দেবতা' ব'লেই সম্বোধন করে।...

"তোমার ছেলে আজ কেমন আছে অতসীর মা?"—প্রশ্ন করে শঙ্কর।

—"আর দেবতা! সেই সকাল থেকেই বেহুঁস্ হ'য়ে প'ড়ে আছে।...এঁরা কে দেবতা?"

—"ইনি আমার দিদি আর ও আমার ছোট বোন। এঁরা তোমার ছেলেকে দেখতে এসেছেন। চল ভিতরে যাই।"

সকলে এসে ঘরের মধ্যে ঢোকে।

একটা অসহ্য দুর্গন্ধে ঘরের বদ্ধ বাতাস যেন ভারী হ'য়ে উঠেছে। ঘরের কোণে একটা অতি দুর্গন্ধময় মলিন ও শতছিন্ন বিছানায় একটি আঠার-উনিশ বছরের যুবক মড়ার মত প'ড়ে আছে।

শঙ্কর যুবকের কাছে এগিয়ে গিয়ে শুধালে—"কেমন আছ ভাই বদন ?"

বদনের কিন্তু কোন সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না।

শঙ্কর ঝুঁকে প'ড়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখলে জ্বরে গা যেন পুড়ে যাচ্ছে।

"ডাক্তারবাবু আসেন নি আজ একবারও অতসীর মা ?"—শঙ্কর শুধালে।

—"না দেবতা।"

—"আচ্ছা আমি এখুনি যাচ্ছি।"

এই ব'লে, শঙ্কর ঝড়ের মতই বেরিয়ে গেল এবং একটু পরে ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল।

ডাক্তার রোগীকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা ক'রে মুখ বেঁকিয়ে বললেন—"নিউমোনিয়া দুই সাইডই এটাক করেছে।"

ঔষধের ব্যবস্থা লিখে দিয়ে এবং শঙ্করের কাছ হ'তে ফিসের টাকা নিয়ে ডাক্তার চ'লে গেলেন।

—"এবারে তা হ'লে আমরা চলি অতসীর মা!

এই পাঁচটা টাকা রাখ। ঔষধ কিনে আন এখুনি। কাল আবার আসব।”......

শৈল যেন বিস্ময়ে একেবারে বোকা ব’নে গেছে। মানুষের এত দুঃখ—এত বেদনা!

“বুঝলে দিদি এমনি ক’রেই দরিদ্রের দিন কাটছে। অথচ এদেরই বুকের রক্তে রাঙ্গান ইট দিয়ে ইমারত তৈরী ক’রে ধনীরা কাল কাটান।”—বলতে বলতে শঙ্কর নিষ্ফল আক্রোশে গর্জ্জাতে লাগল; “অন্যায় অত্যাচার আর অবিচারের বিরুদ্ধেই আমার অভিযান দিদি! অথচ দুঃখ এই যে, দেশের যারা ভবিষ্যতের আশার স্থল—ছেলে-মেয়ে, কিশোর-কিশোরী তা’রা এদিকে একবারও চোখ তুলে তাকায় না।”

“কিন্তু সে কি সম্ভব ভাই?”—শৈল বলে।

—“নিশ্চয়ই সম্ভব দিদি! আর সম্ভব ক’রে তুলতে হ’লে দেশের ছেলেমেয়েদের এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। এই অশিক্ষিত মূক ভাইদের মুখে

দিতে হবে ভাষা। ঐ জর্জ্জরিত ভাঙ্গা বুকের বেদনায় দিতে হবে আশার বারি-সিঞ্চন। এদের বুঝাতে হবে যে, এরা আজ কি হয়েছে এবং কেন হয়েছে; এরা কি হ'তে পারে এবং কেন তা হ'তে পারছে না।"

এইভাবে নানা কথা বলতে বলতে তা'রা নদীর ঘাটে এসে পড়েছিল।

দিদি বললে—"আশীর্ব্বাদ করি ভাই! দীন-দুঃখীদের বেদনায় যেন চিরদিন এমনি ক'রে সহানুভূতির অশ্রু ঝরে!"

"শুধু আমায় নয় দিদি! এই আশিস আমি তোমার মুখ দিয়ে সারা বিশ্বের জননী ও দিদিদের নিকট হ'তে সকল ভাই-বোনের হ'য়ে মেগে নিলাম।"—ব'লে, শঙ্কর নত হ'য়ে শৈলর পায়ের ধূলো নিল। দিদিও ভাইকে বুকে টেনে নিল।

পনের

শঙ্কর যে মিলে চাকরী করত সেখানকার কুলীরা ছাড়াও আর একজন লোক শঙ্করকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবাসত, সেই লোকটি মিলের নূতন অ্যাসিস্‌টেণ্ট ম্যানেজার। শঙ্করের বলিষ্ঠ সতেজ চেহারা, সোজা-সুজি উচিত কথা বলবার সাহস, নির্ভীক ও অমায়িক শিশুর মত সরল ব্যবহার—প্রথম দর্শনের দিন হ'তেই যেন মিঃ রবার্টকে একটা অদৃশ্য স্নেহের টানে টেনে নিয়েছিল।

সেদিন মিলের ছুটির পর কালিঝুলি মেখে শঙ্কর যখন গেট দিয়ে বা'র হচ্ছে এমন সময় মিঃ রবার্ট পাশে এসে ডাকলেন—"মিঃ শঙ্কর!"

—"কে?"

—"আমি মিঃ রবার্ট। তুমি আমার বাঙ্‌লোয় একটিবার আসবে কি?"

—"নিশ্চয়ই। কিন্তু কেন সাহেব? আমাকে কি তোমার কোন প্রয়োজন আছে?"

—"হ্যাঁ—চল।"

মিঃ রবার্টের সঙ্গে শঙ্কর তাঁর বাঙ্‌লোতে প্রবেশ করল।

বেয়ারাকে ডেকে বাইরের লনে দুটো চেয়ার দিতে ব'লে মিঃ রবার্ট বললেন—"একটু ব'স। আমি হাত-মুখটা ধুয়ে আসি।"

শঙ্কর চেয়ারে ব'সে আকাশ-পাতাল কত কি ভাবতে লাগল। কেন যে হঠাৎ সাহেব তাকে এমনি ক'রে ডেকে আনল, কোন মতেই যেন সে তা বুঝে উঠতে পারছে না। সে একজন সামান্য কুলী, আর সাহেব মিলের অ্যাসিস্‌টেণ্ট ম্যানেজার।

এমন সময় হাসতে হাসতে সাহেব সেখানে এসে অপর চেয়ারখানায় ব'সে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বললেন—"খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছ শঙ্কর—নয়? তোমার মতই আমার একটি ছোট ভাই ছিল।

স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বললেন—"খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছ শঙ্কর···"

বছর তিনকে হ'ল সে মারা গেছে।"—বলতে বলতে সাহেবের চোখের কোণ দুটো অতীত স্মৃতির বেদনায় যেন ঝাপ্‌সা হ'য়ে এল।

সাহেব বলতে লাগলেন—"অল্পবয়সে আমরা মা-বাপ হারাই। এক দূর-সম্পর্কীয় কাকার কাছে অনেক কষ্টে মানুষ হয়েছিলাম, কিন্তু টাকার কথা ভেবে কতদিন না ঘুমিয়ে রাত কেটে গেছে। ভাইটির আমার অসুখ হ'ল—বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। আজ আমার সাতশো টাকা মাইনে, অথচ ভাই আর আমার নেই। যে আজ সবার চাইতে বেশী খুশী হ'ত আমার উন্নতিতে—সে আজ চ'লে গেছে পর-পারে।" সাহেবের চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। সাহেব অশ্রু সংবরণ ক'রে বললেন—"তুমি হয়ত বিরক্ত হচ্ছ শঙ্কর, কিন্তু এসব আমার জীবনের কথা।"

—"না না সাহেব, বিরক্ত হ'ব কেন?"

সাহেব আবার বলতে লাগলেন—"তোমার মতই

'জানি' নির্ভীক ও সরল ছিল। গরীবের দুঃখ দেখলে তার চোখ দিয়ে জল পড়ত। এই মিলের গরীব-দুঃখীদের দেখে তোমার প্রাণও সেইভাবেই কাঁদে। আমি আড়ালে থেকে লক্ষ্য করি—কি ভাবে তুমি তাদের আপন ক'রে বুকে টেনে নাও।

"যাক গে—এতক্ষণ আমার নিজের কথাই বলছি; তোমার কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নি। তোমার কে কে আছেন বাড়ীতে?"

—"সাহেব, আমারও তোমার মতই ছোটবেলায় মা-বাপ মারা যান। তবে আমার এক দিদি আছে —সে-ই আমাকে মার মত মানুষ করেছে।"

ক্রমে শঙ্কর তার জীবনের সমস্ত কাহিনীই একে একে ব'লে গেল। শঙ্কর যখন বিদায় নিল, রাত তখন প্রায় দশটা। সাহেব কিছুতেই শঙ্করকে না খাইয়ে ছাড়লেন না।

সামান্য একজন পাঁচ টাকা হপ্তার কুলীর সঙ্গে অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজারের এতখানি মাখামাখি কিন্তু

উপরওয়ালারা ভাল চোখে দেখতে পারলেন না। তাঁরা মিঃ রবার্টকে সাবধান ক'রে দিলেন। মিঃ রবার্ট একটু মুচকি হাসলেন মাত্র।

শঙ্কর রোজই ছুটির পর মিঃ রবার্টের বাঙ্‌লোয় বহুক্ষণ ধ'রে গল্প ক'রে, অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরত।

হঠাৎ একদিন শঙ্কর মিলে গিয়ে শুনল তার জবাব হ'য়ে গেছে। মিঃ রবার্ট সে-কথা শুনে শঙ্করকে ডেকে বললেন—"বিকালে আমার বাঙ্‌লোয় এস শঙ্কু! কথা আছে।"

বিকালে শঙ্কর যখন মিঃ রবার্টের সঙ্গে দেখা করতে গেল, মিঃ রবার্ট তখন লনে চেয়ার পেতে চুপটি ক'রে ব'সে। শঙ্করকে আসতে দেখে আনন্দে ও উৎসাহে ব'লে উঠলেন—"এই যে এসেছ তুমি! তুমি হয়ত শুনে সুখী হবে শঙ্কু, আমি চাকরী ছেড়ে দিচ্ছি; সাম্‌নের মেলেই বিলাত চ'লে যাব।"

—"কেন সাহেব, হঠাৎ ছেড়ে দিচ্ছ কেন?"

—"অমনি। ভাল লাগছে না আর এ দাসত্ব। তা ছাড়া গত মাসে আমার এক দূর-সম্পর্কীয় ঠাকুর্দ্দার উইলে লাখ খানেক টাকা পেয়েছি। তাই ভাবছি দেশে গিয়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করব।"

তারপর একথা সে-কথার পর মিঃ রবার্ট বললেন—"একটা কথা বলব শঙ্কর, যদি তুমি তাতে কিছু মনে না কর।"

—"না না, সে কি—বল না!"

—"তুমিও চল না আমার সঙ্গে। সেখানে আমার কাছে ছোট ভাইয়ের মত থেকে পড়াশুনা করবে। তারপর মানুষ হ'য়ে দেশে ফিরে এস।"

—"তা কি ক'রে সম্ভব সাহেব? এখানে আমার দিদি আছে যে। আমি ছাড়া যে তার কেউ নেই!"

—"কিন্তু এমনি ক'রে জীবনটাকে নষ্ট করবারও তোমার কোন অধিকার নেই ভাই। উপযুক্ত শিক্ষা না হ'লে মানুষের মন কখনও বিকশিত হয় না।

এভাবে নিজেকে বঞ্চিত করবার মধ্যে আর যাই থাক—কোন বাহাদুরী নেই। দারিদ্র্যকে মেনে নেবে কেন? তোমার শক্তি ও চেষ্টা—সে কি এতই দুর্ব্বল যে, দারিদ্র্য তাকে মাথা তুলতে দেবে না? না না শঙ্কর, তুমি আমার সঙ্গে চল। দিদিকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল।”......

দিদি যখন শঙ্করের মুখে সব শুনলে, তখন প্রথম যথেষ্ট আপত্তি তুলেছিল; পরে কিন্তু আবার কি ভেবে বললে—“বেশ তুই যেতে চাস, যা ভাই! স্নেহে অন্ধ হ'য়ে তোকে আজ আটকে রাখব না। তুই দশের একজন হ'য়ে আয়।”

—“কিন্তু দিদি, আমি গেলে কে তোমাকে দেখবে?”

—“আমি না হয় পুষ্পদের ওখানে গিয়ে এ ক'টা বছর থাকব। দেখতে দেখতে বছর ক'টা কেটে যাবে, আবার তুই ফিরে আসবি।”

মুখে মুখে কথাটা গ্রামে রটে' গেল। যারা

শঙ্করকে ভালবাসত তা'রা বললে—"আমরা জানতাম, ও সত্যিকারের মানুষ হবে। যে সত্যিকারের ভাল, তাকে যে ভগবান আপন হাতে বুকের মাঝে টেনে নেন।"

যারা কোনদিন শঙ্করকে ভালবাসতে পারে নি, তা'রা শুনে বললে—"হাড় জুড়াল বাবা! আপদ বিদায় হবে এবার।"

শঙ্কর যাওয়াই স্থির করলে। যাবার আগে একদিন সে হেডমাষ্টার মশায়কে প্রণাম করতে গেল।

সেদিন হেডমাষ্টার মশাই আর কোন কথাই বলতে পারলেন না; তাঁর দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। শঙ্করকে তিনি বুকের মাঝে টেনে নিলেন।

ষোল

মানুষ ভাবে এক, হয় অন্য।

ছোট সাহেব বা শঙ্কর—তা'রা ভাবতেও পারে নি—অলক্ষ্যে তাদের মাথার উপরে কত বড় বিপদের কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে।

সামান্য একটা ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে সেদিন মিলে যেন সহসা একটা প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্ত ব'য়ে গেল। রোলিং মেসিনের ঘরে একজন কুলী কাজ করতে করতে হঠাৎ কেমন বেটক্করভাবে একটা পাটের গাট্রীতে পা আটকে, ছিট্‌কে একেবারে মেসিনের রোলারের তলে গিয়ে পড়ল। মেসিনের তল হ'তে তাকে যখন উদ্ধার করা হ'ল, তখন তাকে আর চিনবারই উপায় নেই! লোকটার নাম ভজু।

ভজু রোলিং মেসিনের কলকব্জার সাথে একেবারেই পরিচিত ছিল না। এই আচমকা

বিপৎপাতের তাও হয়ত একটা কারণ। রোলিং মেসিনে কাজ করত চন্দন। তার অসুখ হওয়ায় বড় সাহেব ভজুকে সেই ঘরে কাজ করতে আদেশ দিয়েছিলেন।

ভজুর স্ত্রী সুখীয়া, স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে ছুটে এল। মিলের চত্বরে ভজুর রক্তাক্ত মৃতদেহটা জড়িয়ে সুখীয়া হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে উঠল।

বড় সাহেব যখন তদন্তে এলেন ছোট সাহেব স্পষ্টই তাঁর মুখের উপর ব'লে দিলেন—"It's your fault. You risked the poor man's life (তুমিই এই গরীবের জীবনের জন্য দায়ী)।"

ছোট সাহেবের কথার ধরণে বড় সাহেব চট্ ক'রে চটে বললেন—"মিঃ রবার্ট, তুমি তোমার সুপিরীয়র কর্ম্মচারীর সাথে কথা বলতে এখনও শেখ নি।"

ছোট সাহেবও সমান ওজনে জবাব দিলেন—"তুমিও একথা ভুলে যেও না মিঃ পীয়ারসন্, যে, আমি তোমার দুই আনা হপ্তার সামান্য একজন কুলী নই।

জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করবার তোমার অধিকার নেই। এই ভজুর জীবনের জন্য দায়ী কে ?···তুমি।

আজ তোমার স্বেচ্ছাচার কর্ত্তৃত্বের হুমকীতে পরের যে সংসারটা ভেঙ্গে গেল, তার কৈফিয়ৎ তুমি কি দেবে ?"

"Street dogs! have they got any life! (রাস্তার কুকুর ওরা ; ওদের আবার জীবন

কি ?)”—তীব্র শ্লেষমাখা স্বরে পীয়ারসন্ জবাব দিলেন।

“চমৎকার! চমৎকার যুক্তি মিঃ পীয়ারসন্! দু’টাকা মাইনের কুলীর জীবন নেই—আছে তোমাদের—যারা ওদেরই রক্তঢালা ন্যায্য পাওনা ছিনিয়ে নিয়ে হাজার টাকা মাইনায় বাবুগিরি ও কর্ত্তৃত্ব ফলাচ্ছ! এই তোমার শিক্ষা!”—বললেন ছোট সাহেব।

বোমার মতই মিঃ পীয়ারসন্ ফেটে পড়লেন—“তোমার ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে মিঃ রবার্ট! আমি তোমায় মিলের ডিসিপ্লিন রাখবার জন্য ডিস্‌মিস্ করলাম।”

রবার্ট তীব্রস্বরে বললেন—“তার আগেই তুমি আমার রেজিগ্‌নেশন নাও।” বলতে বলতে জুতোর মস্‌মস্ শব্দ জাগিয়ে মিঃ রবার্ট ঘর হ’তে নিষ্ক্রান্ত হ’য়ে গেলেন। ... ...

ছোট সাহেবের চাকুরী ছাড়বার সংবাদটা দাবানলের মতই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

শঙ্কর

ভাদ্র মাসের কালো মেঘে আকাশের বুকে কে যেন ঘোর কালির একটা পর্দ্দা টেনে দিয়েছে। নদীর ধারে কুলী-বস্তির মধ্যে একটা মাঠের মত খোলা জায়গায় সমস্ত কুলী সমবেত হয়েছে। গোটা পাঁচেক মশাল দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে। রাতের আঁধারে মশালের রক্তিমাভা যেন প্রেতলোকের বিভীষিকা জাগিয়ে তুলেছে।

একটা টিলার উপরে দাঁড়িয়ে শঙ্কর বলছিল—"ভাই সব, এদের ওই অত্যাচার তোমরা সহ্য ক'রো না। তোমাদের বুকের ভগবান আজ তোমাদের ব্যথায় কাঁদছেন। সে কান্না কি তোমরা শুনতে পাও না? আজ যে ভজুর সংসার ভেসে গেল, এর জন্য দায়ী কে? তোমাদের টাকায় ওরা জুতো কিনে তোমাদেরই ঠোক্কর মারছে। আজ ছোট সাহেবের চাকরী গেল; কারণ তিনি এসেছিলেন তোমাদের হ'য়ে সমবেদনা জানাতে। কাল যাবে আর একজনের; তারপর আর এক জনের।

এরকম অনিশ্চিতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাঁচা চলে না।......”

তখন নৈশ স্তব্ধতা ভেদ ক'রে সুখীয়ার বুকফাটা কান্নার আওয়াজ যেন শতধা চূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছিল।

... ...

পরের দিন সব কুলী ধর্ম্মঘট করল। অত বড় মিল পাষাণের মত স্তব্ধ অনড় হ'য়ে রইল! বড় সাহেবের ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠল!

ব্যাপার বেগতিক দেখে মিঃ পীয়ারসন্ মিলের অন্যান্য কর্ম্মকর্ত্তাদের সাথে গোপনে পরামর্শ ক'রে মিঃ রবার্ট, শঙ্কর ও অন্যান্য দু'চারজন কুলীর নামে একটা মোকদ্দমা রুজু ক'রে দিলেন। তাদের বিরুদ্ধে চার্জ্জ যা গঠন করা হ'ল সে বড় ভয়ঙ্কর—ফলে মিঃ রবার্টের পাঁচশত টাকা জরিমানা, শঙ্করের ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্য কুলীগুলোর কারও দু' বছর, কারও দেড় বছর আবার কারও বা ছয় মাস কারাবাস হ'ল।

শঙ্কর হাসতে হাসতে লৌহশৃঙ্খল হাতে কারাগারের দিকে পা বাড়াল।

হাজার হাজার কুলী চোখের জলের মধ্য দিয়ে তাদের সুখ-দুঃখের সাথীকে বিদায় দিল।

শৈলরও চোখের কোল দুটো ভিজে উঠল। সে শুধু মনে মনে বললে—"ভগবন, তাকে তুমিই দেখো।"

গাঁয়ের পরশ্রীকাতর লোকেরা বলাবলি করতে লাগল—"আরে এ তো জানাই ছিল। অমন গোঁয়ারগোবিন্দ ডানপিটের এর চাইতে আর বেশী কি হবে? হতভাগা গ্রামের নামে কলঙ্ক দিল।"

সতের

পূজা এসে গেল।

শাদা শাদা পেঁজা তূলোর মত হাল্‌কা মেঘের দল নীল আকাশের বুকে পাল তুলে ভেসে চলেছে—কোন্ সুদূরের পথে কে জানে? বিলের বুকে কুমুদ-কহ্লারের দিকভুলান হাসির ঢেউ! সবুজ ধানগাছগুলো বুক-জলে দাঁড়িয়ে হাওয়ার পরশে নুয়ে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে। সোঁ-সোঁ শব্দ জাগে চারদিকে। বেতস-বনে ডাহুক-ডাহুকীর ডাকাডাকি, তার সাথে সুর মিলিয়েছে দোয়েল আর ফিঙে।

আবার মা আসছেন।

ঘরে ঘরে প্রতিমার গায়ে রং করছে। বিদেশ হ'তে প্রবাসীরা সকলে একে একে ঘরে ফিরতে সুরু করেছে; কিন্তু শৈলর গৃহ-কোণ শূন্য! প্রতি বছরের মত এবারেও শৈল শালী ধানের চিড়া

কুটলে। উঠোনের নারকেলগাছ হ'তে নারকেল পাড়িয়ে নাড়ু বাঁধলে—শঙ্কর যে নাড়ু খেতে বড্ড ভালবাসে!

ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একটা দরখাস্ত করা হয়েছিল—শৈল পূজার যে কোন একদিন জেলে গিয়ে তার ভাইর সাথে দেখা ক'রে আসতে চায়। জবাব তখনও পাওয়া যায় নি।

সুজাতা পিসিমার বাড়ীতেই পূজা দেখতে এসেছে। গ্রামে পা দিয়েই পিসিমার মুখে শঙ্কর সম্পর্কে সমস্ত কথাই সে শুনলে। কেমন ক'রে পরের দুঃখে সহানুভূতি জানাতে গিয়ে শঙ্কর কারাগারে গেছে—শুনতে শুনতে তার চোখের কোল দুটো জলে ভ'রে উঠল।

রজত বলেছিল—"শঙ্করের মত ছেলে আমি দেখি নি সুজাতা, গ্রামের লোকেরা ওকে চিনলে না। তাই ত অভিমান ক'রে ও কুলীদের মাঝে গিয়ে আপনাকে বিলিয়ে দিল।" ... ...

তখন দিকে দিকে বোধনের বাজনা বেজে উঠেছে।

চারদিকে চাঁদের আবছা আলো যেন একটা স্বপন-মায়া বিছিয়ে গেছে।

সুজাতা রজতের সঙ্গে শঙ্করদের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'ল। শৈল তখন তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রণাম করছিল।

সুজাতা ডাকলে—"দিদি!"

"কে?"—শৈল চম্‌কে ফিরে তাকালে।

"আমরা।"—সুজাতা ও রজত একসঙ্গে জবাব দিল।

"কে সুজাতা—রজত! এস ভাই, বস।" ব'লে শৈল দাওয়ার উপর একটা মাদুর বিছিয়ে দিল। রজত ও সুজাতা তার উপর বসল।

"শঙ্করের খবর পাও না দিদি?"—প্রশ্ন করলে রজত।

—"হাঁ, সপ্তাহে একবার ক'রে পাই। দেখা

করবার জন্য একটা দরখাস্ত করেছি ; এখনও তার জবাব পাই নি।”

সেদিন ওরা বাড়ী ফিরল—প্রায় রাত্রি দশটায়।

... ...

দরখাস্ত মঞ্জুর হ'য়ে এল।

রতন মাঝিকে অনেক ব'লে-ক'য়ে এক টাকায় যাতায়াত করার রফা ক'রে শৈল যাবার আগের দিন সব ঠিক ক'রে এল। কিন্তু ওপাড় হ'তে ফিরতে রাত হ'য়ে যাবে। সঙ্গে কা'কে নেওয়া যায় ? শৈল রীতিমত চিন্তিত হ'য়ে উঠল। গ্রামে এমন একটি লোক নেই যে তার সাথী হবে। বিশেষ ক'রে দেখা করবার তারিখ দিয়েছে নবমী পূজার দিন। সে-রাত্রে আবার জমিদার-বাড়ীতে যাত্রাগান। প্রতি বছরের মত এবারেও কলিকাতার সেরা দল যাত্রাগান করতে এসেছে। এমন স্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা ফেলে কে তার সাথে বিল ঠেঙ্গিয়ে নৌকোর সাথী হ'য়ে ওপাড়ে যাবে ? রতনই যেতে চাইছিল না।

অনেক ভেবে ভেবে শৈল কোন দিকেই আর কূল পাচ্ছে না। এদিকে দুপুর এসে গেল, বেলা একটার মধ্যে রওনা না হ'লে ওদিকে আবার রাত্রি নয়টার মধ্যে ফেরা যাবে না।

এমন সময় শঙ্করকে দেখতে যাবার দরখাস্তের জবাব এসেছে কিনা জানতে এল রজত। শৈলর কাছে সমস্ত সংবাদ শুনে সে বললে—“এর জন্য তুমি এতক্ষণ ভেবে আকুল হয়েছ দিদি! আমায় একটিবার ডেকে পাঠাও নি কেন? কারও যাবার দরকার নেই। আমিই যাব তোমার সঙ্গে।”

সে-কথা শুনে, শৈল বিস্মিতভাবে রজতের মুখের দিকে তাকালে।

“অবাক হচ্ছো দিদি, আমার কথা শুনে?”—রজত বলতে লাগল—“শঙ্কু আমার ছেলেবেলার বন্ধু। তা ছাড়া বাবা গ্রামের জমিদার হ'য়েও যদি তাঁর নিজের কর্ত্তব্য ভুলেই যান, তা হ'লে আমি ত আমার বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য ভুলতে পারব না।”

শৈলর চোখের কোল দুটো জলে ভ'রে গেল।

... ...

দ্বিপ্রহরের রোদে আকাশ যখন ঝলসে যাচ্ছে—রজত, শৈল ও রতন মাঝি নৌকো ভাসিয়ে তখন ওপাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল।

জেলের কাছে পৌঁছে রজত আর রতন বাইরে দাঁড়াল, শৈল জেলের ভিতরে গেল।

দীর্ঘকাল পরে ভাই-বোনে দেখা হ'ল।

শঙ্করের পরিধানে হাফ্‌প্যাণ্ট ও গায়ে একটা শাদা ময়লা মোটা জীনের কোর্ত্তা। শঙ্করকে দেখে শৈল দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ছেলে-মানুষের মতই হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে উঠল। শঙ্করের চোখেও জল ভ'রে এল।

—"কাঁদ কেন দিদি ?"

—"তোর খুব কষ্ট না রে শঙ্কু ?"—অশ্রুঝরা কণ্ঠে শৈল শুধালে।

—"না ত, [illegible] বললে ?"

"ওরা কি খেতে দেয় না? কেন এত রোগা হ'য়ে গেলি ভাই?"—গভীর স্নেহে শঙ্করের বুকে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে শৈল প্রশ্ন করলে।

—"পাগল! খেতে দেবে না কেন?"
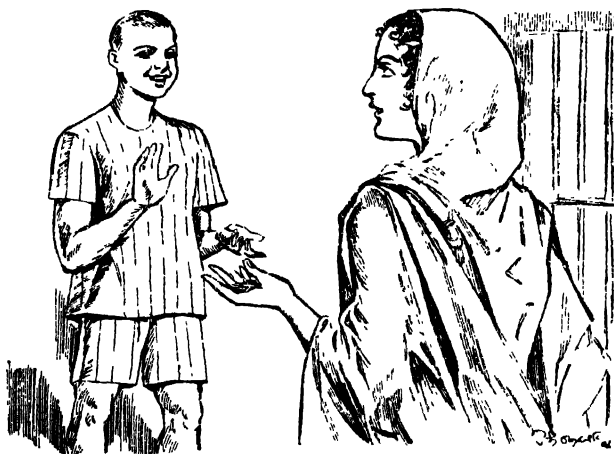
—"হ্যাঁরে শঙ্কু! আমার জন্য তোর খুব মন কেমন করে না?"

"দিদি।" ব'লে, একটা নিঃশ্বাস ফেলে, শঙ্কর

শিশুটির মতই শৈলর বুকে মুখ গুঁজল। দিদির মুখেই শঙ্কর শুনল রজত সঙ্গে এসেছে।

যাবার সময় শঙ্কর বললে—"রজতকে আমার ভালবাসা দিও দিদি! আর তাকে একথাও বুঝিয়ে ব'লো যে, দুঃখীর জন্যে তার বুকের স্নেহ যেন টাকা দিয়ে না কিনতে হয়—ভগবানের আশিস-ধারার মত তা যেন এমনি ক'রেই চিরদিন ঝ'রে পড়ে।"

... ...

যথাসময়ের কয়েকদিন আগেই শঙ্কর কারাগার হ'তে মুক্তি পেলে ছোট সাহেবের তদ্বিরে।

কারাগারের ফটক দিয়ে বের হ'য়ে আসতেই ছোট সাহেবের সঙ্গে শঙ্করের চোখাচোখি হ'য়ে গেল। ছোট সাহেব দু'হাত বাড়িয়ে তাকে আপন বুকে টেনে নিয়ে বললেন—"চল তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি। পরের মেলেই আমরা বিলাত যাব।"

"কিন্তু যাবার আগে কি একবার দিদির সঙ্গে দেখা করব না?"—শঙ্কর বললে।

—"না আর স্নেহ নয়! সামনে তোমার বিরাট কর্ত্তব্য। স্নেহ-ভালবাসা—ও ত চিরদিনের ; নানা মূর্ত্তিতে নানা ভাবে ও দিবারাত্রই প্রকাশ পাচ্ছে ; কিন্তু সময়ের নানা রূপ নেই—একটি মাত্রই রূপ! তাকে হেলায় যেতে দিলে আর চলবে না। চল কলিকাতায় গিয়েই দিদির ব্যবস্থা সব করব।"

... ...

শৈল দিন গণছিল—মাঝে আর মাত্র সাতটা দিন ; তারপরই শঙ্কর মুক্তি পাবে। এ কয়টা দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে।...

শীতের শেষ হাওয়া বইতে সুরু করেছে।

দিবারাত্রি কোকিলগুলো ডাকছে আর ডাকছে —'কু! কু! কু!' হলুদপাখীটাও মাঝে মাঝে ডেকে ওঠে—'বৌ সরষে কোট্!' উঠোনের সজিনা-গাছটায় অজস্র ফুল ধরেছে। টুনটুনিগুলো এ ডাল হ'তে ওডালে লাফিয়ে লাফিয়ে মধু খেয়ে বেড়ায়।

ধান কাটা এবার সুরু হবে। সেদিন সকালে

বসিরুদ্দিনের সঙ্গে শৈল সেই কথাই বলছিল। সেই সময় গ্রামের পিওন নকুল, একটা পুরু খাম দিয়ে গেল। শৈল আশ্চর্য্য হ'য়ে চিঠিটা নিল।

কে আবার তাকে চিঠি দিল? এ সংসারে কেউ ত তার নেই। চিঠিটা খুলতেই শৈল অবাক হ'য়ে গেল। চিঠিটা লিখেছে শঙ্কর।—

"দিদি গো! দিদি আমার! তুমি যখন আমার এ চিঠিটা পাবে, সুনীল সাগরের জল কেটে আমরা তখন জাহাজে ইউরোপের পথে ভেসে চলেছি। তোমায় একটিবার দেখা না দিয়েই চ'লে গেলাম ব'লে দুঃখ ক'রো না দিদি! গ্রামে ফিরে গেলে পাছে তুমি আমায় আর না আসতে দাও—তোমার সেই স্নেহের ভয়েই চোরের মত চুপে চুপে পালিয়ে এসেছি। তা ছাড়া তুমি একদিন তো আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেই।

"তোমার নামে দু'শত টাকা আপাতত: পাঠিয়ে দিলেন—মিঃ রবার্ট। এর পর ওখান হ'তেই টাকা

পাঠান হবে। টাকা আমি নিতে চাই নি ; কিন্তু মিঃ রবার্ট বললেন—আমি তাঁর ধর্ম্ম-ভাই !

"তুমি দুঃখ ক'রো না দিদি। চিরদিনই ত তোমার মনে বড় সাধ ছিল লেখাপড়া শিখে আমি মানুষ হব, দশের একজন হ'য়ে তোমার মুখ উজ্জ্বল করব !

"আবার আমি তোমার কোলে ফিরে আসব দিদি ! পুষ্পকে তুমি দেখো। সে বড় অভিমানিনী। রজতকে আমার এই চিঠি দেখিও এবং তাকে আমার ভালবাসা দিও। আমার প্রণাম নাও।

—তোমার শঙ্কু।"

... ...

সজিনাগাছটার শাদা ফুলগুলো মাটির বুকে ঝ'রে পড়ছে ঝুর-ঝুর ক'রে। টুনটুনি পাখীগুলোর মধু-লোভ যেন আর ফুরাতেই চায় না।

চিঠিপাঠে তন্ময় শৈল অশ্রু-সজল চোখে একবার আকাশের দিকে চাইলে।... ...

—"ও কা'র চিঠি দিদি ?"

শৈল চম্‌কে চেয়ে দেখে তারই পাশে নীরবে

ব'সে আছে পুষ্প। শৈল কোন কথা না ব'লে চিঠিটা পুষ্পর হাতে তুলে দিলে।

—শেষ—